Most respectfully presented to the Bangiya Sahitya Parisad as a token of deep devotion.

The Author.

15th May 1910.

আত্মবোধ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র

প্রণীত

কলিকাতা
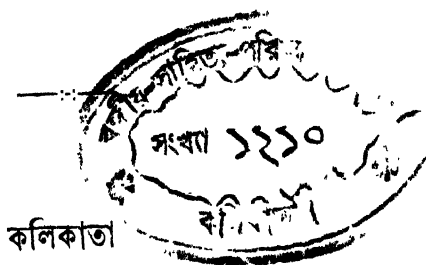
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত

১৩১৪

মূল্য ১৲ মাত্র

উৎসর্গ

প্রণয়াস্পদ বঙ্গবাসীর

পবিত্র হস্তে

আমার বড় আদরের ধন

আত্মবোধকে

প্রীতি উপহারস্বরূপ

সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকারস্য

ভূমিকা।

আত্মজ শ্রীমান্ আত্মবোধ আজ আট নয় বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার আশ্রয়ে রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনের ন্যায় অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছে। সম্প্রতি আপনার সাজ পোষাকে আপনার পরিচয়েই পুনঃ তীর্থ দর্শনের সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু পত্রিকার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আপনার পরিচয়ে সকল স্থানে আদর অভ্যর্থনা লাভের সম্ভাবনা কম। সেই জন্য শ্রীমানের একখানা পরিচয় পত্রের প্রয়োজন।

কিন্তু যেমন দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে প্রচুর প্রণামির চুক্তি না করিলে কেহই কাহারও কোন পরিচয় দিয়া দিতে চায় না। যাহাদের অর্থের আকাঙ্ক্ষা তত নাই তাঁহারাও দরিদ্রকে সেনাক্ত করা নীচ মোক্তারের হীনতার কার্য্য বলিয়া পাশ কাটাইয়া যান। আত্মবোধ দরিদ্র—কাহাকেও ভক্তিশ্রদ্ধা ভিন্ন নগদ কিছুই দিবার সাধ্য নাই। এদিকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গোখেল, তিলক, বন্দো পাধ্যায়ের মিথ্যা অপবাদের ন্যায় বিশ্ববিদ্রোহী বলিয়া শ্রীমানেরও একটা অলীক অপবাদ আছে। আজকাল যেমন আইনের কড়াকড়ি তাহাতে বিশ্ববিপ্লবকারীর সহায়তা-

কারী সন্দেহে ধৃত ও দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় শ্রীমানের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও সকলের সাহসে কুলাইয়া উঠে না। পরন্তু খৃষ্টশিষ্য পিটরের (Peter) খৃষ্টকে অস্বীকার করার ন্যায় আত্মবোধের পরিচিত কেহ কেহও শ্রীমানের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চায়। সুতরাং আত্মজের পরিচয়-পত্রখানি আমাকেই স্বহস্তে লিখিতে হইল। কার্য্যটা সভ্যসমাজসম্মত হইল না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহাই আত্ম-ত্যাগের অন্যতম অনুকল্প ব্যবস্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আত্মহত্যায় সঙ্কল্পিত যুধিষ্ঠিরকে আত্মনাশের অনুকল্পে আত্মগুণগান করিবার পাঁতি দিয়াছিলেন। সুতরাং অবস্থানুসারে আত্মজের প্রশংসা পত্রখানি নিজের লিখিয়া দেওয়া সমাজসম্মত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ প্রায় তিন বর্ষ ধরিয়া মদীয় সহধর্ম্মিণী পুণ্যময়ী শ্রীমতী চিন্তা দেবীর গর্ভে বাস করিয়া আজ অষ্টাদশ বর্ষ হইল ভূতলে অবতীর্ণ হন। তিন বর্ষ মাতৃগর্ভে বাস করায় পাঠকবর্গ শ্রীমানকে অতিমানুষিক মনে করিবেন না—কেননা বড় বড় পুণ্যশ্লোক মহাত্মারা যে তিন বর্ষেরও বেশী মাতৃগর্ভে বাস করেন তাহার নজীর আছে। সে

যাহা হউক আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের আশীর্ব্বাদে ও সমাদরে ক্রমে পুষ্টাঙ্গ হইলে নবম বর্ষ বয়ক্রম কালে উপনয়ন উপলক্ষে শ্রীমানকে হিন্দু-পত্রিকার পবিত্র হস্তে সমর্পণ করা হয়। শ্রীমানের জাতকর্ম্মোক্ত নাম ছিল **"মায়াবাদ"**, উপনয়ন উপলক্ষে তাঁহার আর একটী গুহ্যনাম "আত্মবোধ" রাখা হয়। পত্রিকাশ্রমে উভয় নামেরই প্রচার আছে। কিন্তু মায়াবাদ নামটার একটা কলঙ্ক আছে। নাম শুনিয়াই কেহ কেহ,—মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সুতরাং ভুজঙ্গ দৃষ্টে ভেকের ন্যায় অনেকেই শ্রীমানের নাম শুনিয়াই দৌড়াইয়া পলায়। কাযে কাযেই সেই অন্নাশনের প্রিয় নামটী রদ করিয়া উপনয়নের **আত্মবোধ** নামটীই রেজেষ্টারী করা হইল।

পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে কয়েকটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বিশ্বাস করেন যে, পরিদৃশ্যমান সকলই বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সত্য। আর এক পক্ষ বলেন যে দৃশ্যমান যত কিছু তাহার বাহার যেটিকে যেমন দেখিতেছি—সেটি ঠিক তেমন নয়—চূর্ণকে দধি বলিয়া, শুক্তিকে রজত বলিয়া বা রজ্জুকে সর্প বলিয়া যেমন ভ্রম হয় এ তেমনি একটীকে আরটী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অতএব কোন কিছুরই নিরপেক্ষ

প্রকৃত অবস্থা আমরা জানিতে পারি না। তৃতীয় পক্ষ বলেন যে পরিদৃশ্যমান সকলই বর্শীও নয় তর্শীও নয় পরন্তু স্বপ্নদৃষ্টবৎ অবস্তু নিষ্ঠ অলীক।

আত্মবোধ তৃতীয় মতের মন্ত্রে দীক্ষিত সুতরাং তিনি বলেন যে পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবিকতা নাই, সুতরাং এক বস্তুকে বস্ত্বন্তর বলিয়া ভ্রমেরও সীমা ছাড়াইয়া স্বপ্নরচিত জগতের ন্যায় ইহা একেবারেই বস্তুশূন্য। এই বিশ্বাসের কথাটাই আত্মবোধ নিজের কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

সংসারে আসিয়াই জীবকে পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে বসত বাস, চলা ফেরা, করিতে হয়। সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ এ সকলই বা কি এবং এ সকলের সহিত আপনার সম্বন্ধই বা কি জীবকে এ সকল বুঝিয়া সুঝিয়া লইতে হয়। বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে ইহার কোন কোন কথার বিচার ও মীমাংসার চেষ্টা থাকিলেও একটী গুরুতর কথা তাহাতে নাই এবং সেই গুরুতর তত্ত্বটী অন্য যে সকল দেশীয় ও বিদেশীয় পুস্তকে আছে তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালীরই জানিবার সুবিধা নাই। বিশেষতঃ কথাটা সাধারণকে বুঝাইবার মত করিয়া সাধারণের

ভাষায় কেহই বলেন নাই বলিয়া তাহা সাধারণের কর্ণে ধরা পড়ে নাই। সুতরাং তাদৃশ অজ্ঞ সাধারণের ভাবনা চিন্তা করিয়া দেখিবার সুবিধার জন্যই আত্মবোধ রঙ্গাঙ্গনে নামিতেছে।

আত্মবোধ নূতন কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভের আশা করেন না। ইনি পুরাতন কথাটাই কহিবেন—কেবল বলিবার ধরণটা নূতন হইতে পারে। আত্মবোধ বুঝাইয়াছেন যে আমরা যাহা কিছু দেখি তাহার মধ্যে যে একটা বাহ্য বস্তু থাকে ইহার কোন প্রমাণ নাই। আমরা কেবল ভাবি যে একটা কিছু আছে। কিন্তু কেন এমন ভাবি? যে স্থলে কিছুই নাই, সে স্থলে যে এত বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখি ইহা কি সবই ভেল্কি, সবই ফাঁকি? বাতুল ভিন্ন কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি দৃশ্যমান জগতকে বস্তুশূন্য বলিবে?

তা, সে কথাটাও একেবারে মিথ্যা নহে। সুরাপ্রতিগ্রাহী কোন্ দেবতা সুরাবিদ্বেষী অসুরকে ঘৃণা না করে? কোন্ গঞ্জিকাধূমাবিষ্ট ব্যক্তি ধূমপানবিরতকে প্রকৃতিস্থ মনে করে? সংসারের গতিই এই মত। মায়ামোহের বিচিত্র লীলাই এইরূপ। ঈশ্বর অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন—যে স্থলে কিছুই ছিল না সেই স্থলে

তাঁহার অবটনঘটনপটীয়সী শক্তিবলে, পরিদৃশ্যমান এই সকল সত্য সত্যই হইয়াছে এ কথাটা সকলেই বুঝিতে—অন্ততঃ বিশ্বাস করিতে পারে। তাহাতে কাহারও পেটেরও অসুখ হয় না—মাথাও ধরে না। কিন্তু অবস্তুতে বস্তু দর্শন—সেটা বুঝিতে বিশ্বাস করিতে সকলেরই যেন শ্বাসরোধ হয়, গলায় বাধে, চক্ষে ফোটে! আর্য্য সন্তান ব্রহ্মার মানস-সৃষ্টির কথা বিশ্বাস করে—বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি সুপরিচিত দেবর্ষিদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবে কিন্তু পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মায়াকল্পিত মানসরচনা বিশ্বাস করিবে না!! ফলতঃ ঈশ্বর শূন্য হইতে বিশ্বরচনা করিয়াছেন ইহা বুঝিতে গেলেই বস্তুশূন্য মানসসৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতে হয়। কেন না—অবস্তু উপাদান রচিত বিশ্ব কখনই বস্তু-ময় হইতে পারে না।

যাঁহারা স্বপ্ন বা মদাতঙ্ক ইত্যাদি অবস্থার দৃষ্টান্তে অবস্তুতে বস্তু ভ্রম অসম্ভব মনে করেন না, তাঁহাদেরও মনে এমন একটা খটকা হইতে পারে যে সর্ব্বশক্তিমান সত্যময় পরমে-শ্বর কেনই বা তাঁহার আশ্রিত জীবকে এমন ভ্রম প্রমাদের মধ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবেন?

ঈশ্বর কেন মানুষকে ভুল দেখান, সে কথার আলোচনা আত্মজ্ঞানের অধিকারভুক্ত নহে। সুতরাং শ্রীমান্

অনধিকার চর্চ্চা করেন নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এমন না হইয়া তেমন হইল কেন সে কথায় আমাদের প্রয়োজন কি? ভগবান তাঁহার কি কার্য্য সাধনার্থ আমাদিগকে দিয়া কার্য্য করাইতেছেন তাহা আমাদের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই;—কেন না তাহা বুঝিতেই দিন ফুরাইয়া যাইবে, কার্য্য করা ঘটিবে না। আমাদিগকে কি করিতে হইবে এবং তাহারই কতদূর কি করিলাম সেইটুক মাত্র জানিতে পারিলেই আমাদের যথেষ্ট।

তবু কথাটা যখন উঠিয়াছে এবং অনধিকার চর্চ্চা করাও যখন জীবের একটা প্রকৃতিসিদ্ধ বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন কেন যে ঈশ্বর জীবকে এমন ভুলাইয়া থাকেন তাহার একটু আভাস দিব। মানুষ পরেশের বাপ মা সাজিতে পারে,—তাঁহার ঠিকুজি কোষ্ঠী লিখিতে পারে, আর আমি সেই কীর্ত্তিধ্বজের কীর্ত্তিকাহিনী রচিতে পারিব না।

সৃষ্টি ঈশ্বরের একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি। সৃষ্টি-ব্যাপার-রূপ অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দ্বারাই সেই অদৃশ্য ও অব্যক্তকে সুদৃশ্য ও সুব্যক্ত করিয়া থাকি। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই। এখন এই সৃষ্টির মানে কি? না, যাহা ছিল না তাহাই গড়ান—

কিন্তু

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

যাহা ছিল না বা নাই তাহার অস্তিত্ব এবং যাহা আছে তাহার নাস্তিত্ব ঘটিতে পারে না। সুতরাং অসৎ হইতে সতের সম্ভাবনা—নাই যে উপাদান তাহা দ্বারাই বস্তুনিষ্ঠ কিছু গড়ান হইতে পারে না। এমন স্থলে যদি অসৎ হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি বা গঠন বর্ণিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে সেই গঠিত পদার্থটাও অসৎ—বস্তুহীন। ফলতঃ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না; তবে অসৎ হইতে অসতীর বিকাশ হইতে বাধা নাই। তাই যে স্থলে কিছুই ছিল না সেই স্থলে কিছু দেখা গেলেই বুঝিতে হয় যে দৃষ্ট পদার্থের মূলে কোন বস্তু নাই। কিছু আছে এমন যদি মনে হয় তবে বুঝিতে হয় যে সেটা মনের কল্পনা বা ভ্রম মাত্র। অথবা বুঝিতে হয় যে জীবের সৃষ্টি শক্তি আপনারই অবস্তুময়ী চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকেই বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে।

এই ভ্রমও কিন্তু ভ্রমাপবাদ নহে; আত্মশক্তির আত্ম-পরিচয় পদ্ধতি মাত্র। অবস্তু হইতে বস্তুর সৃষ্টিকার্য্যে জীব-হৃদয়-বিহারী পরমেশ্বর কতদূর সিদ্ধ হস্ত তাহারই পরীক্ষার্থ

এই ভ্রান্তি দর্শন। সিসৃক্ষা বশতঃ পরমেশ্বর যে বিচিত্র বিশ্ব বিরচন করিয়াছেন তাহার মূলে যে বস্তু মাত্র নাই এইটুকু বুঝা না বুঝার—জানা না জানার উপরেই সদামুক্ত জীবের বন্ধন ও মুক্তি সংস্থাপিত। তুমি আপনার মায়োদ্ভূত অবস্তুময় সংসারকে তোমা হইতে স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু ভাবিয়া তাহার প্রেমে মজিলে—ভো মজিলে—

ঊর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজ্যতে সংহরত্যপি।

জাগ্রৎ স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ।

৩৩ ব্রহ্মোপনিষৎ।

তোমাকে মাকড়সার মত আপনা হইতে এক একবার জাল বিস্তার আবার আপনাতেই সেই জাল গুণ্টন করিতে করিতে চৌরাশী লক্ষ যোনি বেড়াইয়া আসিতে হইবে—তবে দেখে শুনে যখন বুঝিবে যে অসতীকে সতী মনে করিয়া বৃথায় এত ভোগ ভুগিতেছিলে তখন বেশভূষিতা বেশ্যা উলঙ্গাবস্থায় ধরা পড়িবে আর সে একদিক দিয়া সর সর সরিয়া পড়িবে এবং তুমিও বাহ্য চাকচিক্যে ঢাকা সৌন্দর্যশূন্যা সেই সামান্যা বীভৎস দিগম্বরী মূর্তি দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া অন্য দিক দিয়া সরিয়া পড়িবে—তোমার সংসারলীলা সাঙ্গ হইবে—তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাইবে।

আর পরিদৃশ্যমতী এই প্রকৃতি রমণী যে অসতী, ইহার বেশ ভূষার অন্তরালে যে বস্ত্রহীন দিগম্বরী সাজ, তাহাই বুঝাইবার জন্য পরমপিতা পরমেশ্বর পরমমাতা মহামায়া এই পরিদৃশ্যমান জগতে শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম—বায়স্কোপিক জড়দৃশ্যে সজীবতা ভ্রম—জলশূন্য মরুতে জল ভ্রম—এ সকল এক বস্তুতে বস্তুন্তর ভ্রম ছাড়াইয়া তোমাকে প্রত্যহ স্বপ্নের বস্তুশূন্য বাস্তবিকতা দেখাইয়া দিতেছেন।

জীবকে বুঝাইবার জন্য মায়াময়ী এত দেখাইতেছেন কিন্তু জীব সহজে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কেন না ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাহার চেতনা জন্মিবার সূত্র হইতেই অজ্ঞানের আলো-আঁধারিতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া জীব যে কেবল ভ্রান্তিই অর্জ্জন করিতে থাকে। দীর্ঘকাল এই রূপ ভুল বুঝিবার পর উপার্জ্জিত ভ্রান্তিময় জ্ঞানে দৃঢ়াভ্যস্ত হওয়ার, বিশেষ সুযোগ ব্যতীত, সেই অজ্ঞান ঘুচান বড় সহজসাধ্য হয় না। এমন কি ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও আফিংখোরের আফিংত্যাগের মত, অনেকে চিরাভ্যস্ত সেই নেশা ছাড়িতে চায় না—পারে না। সৌভাগ্যবান্ অল্প লোকই সেই কদভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে।

কেহ বলিতে পারেন যে দৃশ্যমান জগৎ যদি অবাস্তবিকই হয়—চতুর্দ্দিকস্থ পিতামাতা, ভাই, বন্ধু, শত্রু মিত্র এ সকলও তবে অবাস্তবিক—স্বপ্নদৃষ্টবৎ অলীক। তবে শ্রীমান্ কাহাকে কি বলিবার জন্য এত বাগাড়ম্বর করে ?

কথাটা নিতান্তই ফেলান যায় না। অন্ততঃ কথাটা শুনিয়া অনেকে জগতের অবাস্তবিকতায় বিশ্বাস করিতে করিতে করিতেছে না—পাশার পাকা ঘুটুর কাঁচিয়া যাওয়ার মত কেহ কেহ মন্ত্রগ্রহণ করিয়াও পরে তাহা ভেড়ার কর্ণে দিতেছে। সুতরাং কথাটার একটু সমালোচনা আবশ্যক।

আমি মুখে জগতের অবাস্তবিকতা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ যখন সেই অবাস্তবিক পদার্থ সকলের তুষ্টির জন্য কিছু বলা কহা আবশ্যক মনে করিতেছি তখন ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসের গভীরতায় দোষ স্পর্শিতে পাবে ভিন্ন ইহাতে জগতে বাস্তবিকতা সিদ্ধ হয় না—কেননা আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তদন্তর্গত পদার্থ সকলের পারমার্থিক নাস্তিত্ব অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। তবে বিশ্বাসে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাসটীকে এখনও আমি হজম করিয়া

আত্মগত—আপনার অস্থিমজ্জায় পরিণত করিতে পারি নাই। তাহা যে দিন পারিব সে দিন স্বয়মমনস্কম শ্রোত্রম পাণিপাদিং জ্যোতির্ব্বর্জিতম্। ন তত্র লোকা ন লোকাঃ, দেবো ন দেবাঃ, বেদা ন বেদাঃ, যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্নুষা ন স্নুষা, চণ্ডালো ন চণ্ডালঃ, পৌক্কসো ন পৌক্কসঃ, শ্রমণো ন শ্রমণো, পশবো ন পশবঃ, তাপসো ন তাপসঃ। ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি।

১৮ ব্রহ্মোপনিষদ্।

বাহ্য জগতের সমুদয় দৃশ্য একেবারে প্রতিসংহৃত হইবে। কিন্তু যত দিন ততটা দূর অগ্রসর হইতে পারা যাইতেছে না ততদিন, তোমার তথাকথিত বাস্তব জগতের সন্তানগণের হিতার্থে পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায়,—আমার কল্পিত জগতের প্রজাসাধারণের পিতা মাতা, ভাই বন্ধু সকলের হিতার্থে আমাকে সকলই করিতে হইবে। পরমার্থতঃ মদীয় মায়া জগতের মায়িক প্রজার হিতার্থে এই মায়িক গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। মদীয় মায়া রাজ্যের বাহিরে ইহার জ্ঞান থাকিবে না। অথচ আমার মায়া-রাজ্যের মধ্যে আমার বিধি ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ। স্বপ্নদ্রষ্টার কার্যাকার্য্য স্বপ্ন-দৃষ্টের সমালোচনার অতীত। ফলতঃ যতদিন আমার স্বপ্নরাজ্য থাকিতেছে তত দিন এ রাজ্যের প্রজাও

থাকিতেছে। স্বপ্নভঙ্গে এ আমিও থাকিব না—আমার এ রাজ্যও থাকিবে না।

কাহারও এমন মনে হইতে পারে যে সংসার বস্তুময়ই হউক আর অবস্তুময়ই হউক তাহাতে জীবের লাভ লোকসান নাই। সুখদুঃখ উভয় বস্তুই সমান। বাস্তবিক আগুনে পুড়িয়া মরিতে লোক যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে, কাতরক্রন্দনে দিক ফাটাইয়া দেয়, অবস্তুময় মায়িক আগুনের মায়িক দহনে মায়িক জীবও তেমনই যন্ত্রণায় ধড়ফড় করে—চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে। কোন প্রভেদ নাই।

তবুও প্রভেদ আছে। জড়ের ন্যায় অজ্ঞানীর পক্ষে উভয়ই তুল্যমূল্যের বটে। তা তুল্যমূল্যের না হইলে পরমেশ্বরের সৃষ্টি-চাতুর্য্যই যে ফুটিতে পারিত না। কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে উভয়ের প্রভেদ বিস্তর। অজ্ঞানী যে কালে বায়োস্কোপিক ব্যাঘ্রের কুর্দ্দনে ভয়ে চীৎকার করে—তত্ত্বজ্ঞ সে কালে দ্রংষ্ট্রাকরাল ব্যাঘ্রের কার্য্য দেখিয়া কৌতুকামোদ প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানী যে কালে মায়া সর্প দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইতে থাকে, তত্ত্বদর্শী সে কালে মায়াসর্পকে আপনার জটায় জড়াইয়া দশ জনকে খেলা দেখাইতে থাকে। অজ্ঞানী দিবা দ্বিপ্রহরে আপনারই গৃহাঙ্গনে শ্মশান-চিত্র

দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে, আর তত্ত্বদর্শী অমা রজনীর ঘোর অন্ধকারেও প্রান্তরস্থ শ্মশানের শব-শিবাকুলা জনহীনতার দৃশ্য দেখিয়াও ভীত না হইয়া বরং জন্মমৃত্যু সমস্যার পূরণ করিতে করিতে অপার আনন্দ ভোগ করে। সীতা পটস্থ শূর্পণখা, তাড়কাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিতা আর লক্ষ্মণ সীতার ভ্রান্তি দেখিয়া হাসিয়া কুটপাট। অজ্ঞানী প্রতি মুহূর্ত্তে মরণাশঙ্কায় অবসন্ন আর জ্ঞানবান্ জরাজীর্ণ বস্ত্রত্যাগ করিয়া নূতন বেশ ধারণের সুযোগ প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

বস্তুতঃ যিনি জগতের অবাস্তবিকতা বুঝেন, তিনি সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সম্পশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনা।

১০ কৈবল্য

পরিদৃশ্যমান জগতকে আপনারই শক্তিনিহিত অথবা আত্মশক্তিকেই জগতরূপে প্রকাশিত দেখিয়া তিনি পরম ব্রহ্মত্বানুভব করেন এবং ইহা ভিন্ন সোঽহং ব্রহ্মত্ব লাভের অন্য হেতু নাই—পথ নাই।

সুতরাং পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয়ের প্রকৃত পরিচয়ের উপর আমাদের সুখদুঃখ ভক্তিমুক্তি অনেকটা নির্ভর করে

এবং এই জগৎ যে ছায়াবাজী বা বায়স্কোপিক দৃশ্যাতীত স্বপ্ন জগতের মত বস্তুশূন্য বাস্তবিক দৃশ্য, মায়ামোহিত দ্রষ্টারই মায়াকল্পিত রাজ্য এই কথাটা বুঝাইতে—অন্ততঃ তদুপলক্ষে কথাটা সকলের মনে উঠাইয়া দিবার জন্যই আত্মবোধের এই উদ্যম।

ইহাতে আত্মবোধ কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে তাহা ভবিতব্যভাবী গর্ভে রহিয়াছে। আমরা কিন্তু কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করি না।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারমে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভু র্মা মে সাঙ্গোঽস্ত্যকর্ম্মণি।

কেন না—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তুহি তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।

পরেশ্বরই সকলের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া, ঘাড়ে ধরিয়া করানের মত, সকল কার্য্য করাইতেছেন—

কেবল—

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতিমন্যতে

আহাম্মুকেরাই তাঁহারই কৃতকার্য্যকে আপনার কৃত বলিয়া বড়াই করে। আমরা কিন্তু

যৎকরোমি যদশ্নাষি যজ্জুহোমি দদামি যৎ
যৎ তপস্যামি চৈবাত্র তৎ করোমি তদার্পণম্ ।

আর সেই পরমোদার পরমেশ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোতু তস্মৈ প্রবচ্ছতি
সোঽপি তদ্ভক্ত্যাপহৃতমশ্নাতি প্রযতাত্মনঃ ।

পত্র, ফল, পুষ্প, জলাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বের ন্যায়, কেহ বুঝিয়া সুঝিয়া আপনার কৃত যাবদীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের, কর্ম্মাকর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলে তাহা অযথা অপাত্রে অর্পিত হয় না—শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তি নিবেদিত কার্য্যকে আপনারই কৃত জানিয়া আপনাতেই আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণনামের সার্থকতা দেখান কার্য্যত: আত্মবোধ তাঁহারই সঙ্কল্পিত, তাঁহারই রচিত আমরা উপলক্ষ মাত্র—সুতরাং ইহার ফলাফল

তস্মৈ সমর্পিতমস্তু

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
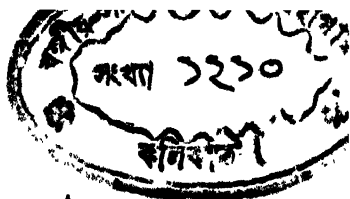
আত্মবোধ।

সূচনা

অহো! কি বিষম মরীচিকাময়ী ভ্রান্তি! কি দুঃসহ পরিতাপ! নির্ব্বোধ বালক যেমন রত্নগর্ভ সাগরের উপকূলে বসিয়া মনের আনন্দে রত্নজ্ঞান করিয়া শম্বুক সংগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনই এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া জ্ঞানাভিমানে আমি এতকাল জ্ঞানরত্ন ছাড়িয়া কেবল অজ্ঞান-ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছি, আর পরমানন্দে তাহাই আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছি; বিশ্ব-উদ্ভাসক আলোকে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছি! অর্থলোভে অন্ধ হইয়া অকৃত্রিম রৌপ্যচক্র জ্ঞান করিয়া অনর্থকর পারদাবৃত তাম্রচক্র আগ্রহপূর্ব্বক অঞ্চলে বান্ধিয়াছি! অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, যখন স্থির হইয়া বসিয়া আমার শ্রমলব্ধ রৌপ্যমুদ্রাকে পরীক্ষা-প্রস্তরে বাজাইতে যাইব, তখন তাহার সেই সুমধুর শব্দ বাহির হইবে না এবং দুই

চারিবার ঘষামাজা করিলেই তাহার উপরের উজ্জ্বল পারদাবরণ উঠিয়া যাইবে, আর নীচে তাম্র দেখা যাইবে!

এ সকল অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বুঝাও তো সহজ নহে। এই বিশ্বসংসার ঠিক একটা আদ্যন্তহীন যাদুগৃহ। ইহার কেন্দ্রস্থান সর্ব্বত্রই, কিন্তু পরিধি কোথাও দেখি না! এই যাদুগৃহে অসংখ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকার মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কোন দ্রব্যকেই তো ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এই ঘরের প্রত্যেক পদার্থেরই অসংখ্য গুণ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র পাঁচটা গুণ আলো-আঁধারিতে অমনি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণরূপে যেন দেখিতে পাইতেছি, আর তাহাতেই কখনও অসীম আনন্দে পুলকিত, কখনও দুঃসহ দুঃখে সন্তাপিত হইতেছি। এদিকে এই যাদুঘরের কর্ত্তা যাদুকর যিনি, তাঁহাকে খুজিয়া পাইতেছি না। সে মহাপুরুষ যে কোথায় কোন্ কেন্দ্রস্থানে বসিয়া "রাহুচণ্ডালের হাড়" ঘুরাইয়া আমার চোখে মুখে ভেল্কি লাগাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অহঙ্কারবশে ভেল্কি বুঝি বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, কিন্তু শতবার শত চেষ্টা করিয়াও ভব-ভেল্কীদারকে ধরিতে পারি নাই। অব্যক্তব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান সেই যাদুকর

আমার সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া—আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া—সমগ্র যাদুঘর জুড়িয়াই বসিয়া আছেন ; আমি সমগ্র চেষ্টা করিয়াও সেই জগৎ-যাদুকরকে দেখা দূরে থাকুক, যাদুঘরের কোনও পদার্থকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না এবং যাহা কিছু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না যে, পদার্থগুলির কোনও বাস্তবিক সত্ত্বা আছে, না সবই ফাঁকি !

"স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।"

আমার চক্ষে যদি ভেল্কি লাগিয়া থাকে, তবে এ রহস্য-ভেদ করিয়া যাদুঘরের প্রত্যেক পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিবার সকল চেষ্টাই আমার বিফল হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থসকলের পরিচয় দিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় নামধারী যে পাঁচজন আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে এবং যাহাদের অকৃত্রিম সাহায্যের ভরসায় আমি এই দুরপনেয় মায়ার উচ্ছেদ সাধন করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারা এক দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র করিয়া যেন আমাকে ধারাবাহিকক্রমে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে ; অথচ আমি এতদিন তাহাদের প্রতারণা বুঝিয়া উঠিতে অথবা বুঝিয়াও সেই প্রতারণা-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে পাঁচজন আমার প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে পদে পদে স্খলিতপদ করিতেছে, তাহারা আমার পরমাত্মীয় ; এমন কি, তাহারা না থাকিলে আমি নিজেও থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেই পরমপ্রিয় পাঁচটী কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঈশ্বরত্বও কামনা করি না! মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আততায়ী প্রতারক স্বজনদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য হইলেও আমি মায়াবশতঃই তাহা করিতে পারি না। কেন না—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ-যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।"

প্রতারণাপরায়ণ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধেচ্ছু দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, মুখ শুখাইয়া যায়! কেন না—

"যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥"

ইহারা সেই সকল লোক, ধন-প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহাদের জন্যই আমার সমুদায় সুখভোগ এবং রাজ্যকামনা অতএব—

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন!
অপি ত্রৈলোক্য-রাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥"

ইহাদিগকে বধ করিলে, পৃথ্বী দূরের কথা, যদি

ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে, তথাপি আমি ইহাদিগকে মারিতে চাই না। বরং ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক, তাহাও স্বীকার্য্য। ফলতঃ কুটম্বমহাশয়দিগকে ত্যাগ করিলে আমার মোক্ষলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে চাই না। এই কুটম্বমহাশয়েরা সকলে সহজাত ভ্রাতা; ভাইসকলে একমত হইয়া আমাকে ক্রমাগত ঠকাইতেছে, আর আমার দুর্দ্দশা দেখিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না। ধূর্ত্তলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে এক পথ দেখাইতে অন্যপথ দেখাইয়া আমোদপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইহারা সুখকে দুঃখ, আলোককে অন্ধকার, সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে! এ অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার বিদ্যমানতা আমি এতকাল বুঝিতে পারি নাই, অথবা কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।

কপট ইন্দ্রিয়-পাঁচটীর সাহায্যে আমি বাহ্যজগতের যে অত্যল্পাংশ বুঝিতে পারি, তাহা যে নিরপেক্ষ সত্য নহে, ইহা জানিতে পারিলে কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব একবার ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব যে, আমার ঐ সকল অন্তরঙ্গ মহাশয়েরা আমার

সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন,—কেমন "অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ" করিয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া তাঁড়াইয়া থাকেন; কপট তোষামোদকের মত কেমন কৌশলে আপনাদের অন্নদাতা মনকে তাহার সম্পদের সময় অবিরত খাম-খেয়ালী খোসগল্পে ভুলাইয়া দিয়া, বিপদের সূত্রপাতেই ক্ষিপ্রপদে সরিয়া পড়েন !

বাহ্যজগৎ

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ, উপরে সুবিস্তীর্ণ সুনীল চন্দ্রাতপ-তলে সমুজ্জ্বল দীপালোকে সমুদ্দীপিত অসংখ্য হীরক; সম্মুখে অভ্রভেদী স্তম্ভাশ্রয়ে বিজলী-বিলসিত বিচিত্র বারিদ-পুঞ্জ; পদতলে জীবসঙ্কুল-বায়ুসাগরের মধ্যবর্ত্তিনী স্থাবর-জঙ্গম-জননী বিপুলসৌন্দর্য্যময়ী রত্নাকরাম্বরা ধরণী; চারি-দিকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব—এ সকল সম্বন্ধে আমার যাবতীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। অতএব বাহ্যজগৎ যদি বাস্তবিকই থাকে, আমি তাহাকে কেবলমাত্র সেই কয়প্রকারে জানিতে পারিতেছি, যে কয়-প্রকারে জানিবার উপযোগিতা—অর্থাৎ উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বত্তা আমার আছে। বাহ্য-জগতের অনন্ত গুণ থাকিলেও আমি কেবল মাত্র ইহার ততটী গুণ জানিতে পারি, যতটী গুণ-

গ্রহণক্ষম যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয় আমার আছে। কতটী ইন্দ্রিয় আমার আছে, তাহা এখনও স্থির বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ স্পষ্ট-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীমাত্র আছে বলিয়া বুঝি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটী মাত্র অবস্থা জানিতে পারি বলিয়া মনে করি। স্থূলতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ্য-জগতের এই পাঁচটী অবস্থা আমি জানিতে পারি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের এই পাঁচটীমাত্র গুণ স্বীকার করি। ইহার অতিরিক্ত আর যতই গুণ বাহ্য-জগতের থাকুক না কেন, আমি সহজে তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার অস্তিত্বও স্বীকার করি না। কিন্তু ইহা অতিমাত্র সম্ভাবিত যে, জগতের অসংখ্য গুণ রহিয়াছে, আর সেই অসংখ্য গুণ গ্রহণের উপযোগী অসংখ্য ইন্দ্রিয়ও আছে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় আমার নগণ্যযোগসাধন-শূন্য স্থূল ঐহিকপরমায়ুকালের মধ্যে আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের এবং বাহ্যবস্তুর প্রত্যেক গুণের সহিত তদ্‌গ্রাহক আমার ইন্দ্রিয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া আমি এপর্য্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়ের এবং জগতের গুণের অসংখ্যত্ব বুঝিতে পারি নাই।

যাহা হউক, সাধারণ নির্দ্ধারণানুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং

জাগতিক যাবতীয় পদার্থের পঞ্চ গুণের একবার আলোচনা করিব। আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, জিহ্বা। যাহা দ্বারা আমি যাবতীয় বস্তুর রূপজ্ঞান লাভ করি, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়; চক্ষু যাহার অধিষ্ঠানভূমি এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা রূপ; যাহা দ্বারা আমার শব্দজ্ঞান জন্মে, তাহা কর্ণাধিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা শব্দ; যাহা দ্বারা আমার গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা নাসিকাধিষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা গন্ধ; যাহা দ্বারা আমি স্পর্শানুভব করি, তাহা ত্বগধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্পর্শ; যাহা দ্বারা রসানুভব করি, তাহা জিহ্বাধিষ্ঠিত রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহা রস। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক। রূপের পরিচায়ক চক্ষু এবং চক্ষুর পরিচায়ক রূপ; রসের পরিচায়ক রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের পরিচায়ক রস, ইত্যাদি; সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এতদুভয়ের একের জ্ঞানাভাবে অপরের জ্ঞান হয় না; ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে যে পাঁচটী মাত্র অবস্থা আমি জানিতে পারি,

তাহা সুখ-দুঃখাত্মক দুইভাবে অনুভব করি। সুরূপ দর্শনে মন যেমন প্রসন্ন হয়, কুরূপ দর্শনে মন তেমনই বিষণ্ণ হয়; সুরস যেমন প্রীতিপ্রদ, কুরস তেমনই বিরক্তিকর; চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভে হৃদয় ও মন যেমন শীতল হয়, পুরীষের পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র তেমনই জ্বলিয়া যায়—মন যেন অস্থির হয়। মলয়মারুতের মৃদুপ্রবাহ-সঞ্চালিত সুমধুর সঙ্গীতে শরীর ও শ্রবণ যেমন জুড়াইয়া যায়, বর্ষার করকা-ঘাতে ও বজ্রনিনাদে তাহারা তেমনি বিদীর্ণপ্রায় হয়; সুতরাং আমার সুখ-দুঃখ অনেকটা আমার অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়-মহাশয়দিগের অনুগ্রহনিগ্রহের উপরই নির্ভর করে। যদি আমার কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়-লভ্য সুখ-দুঃখেরও অভাব হয়। যখন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হই, তখন যেমন সুরূপ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই, তেমনি কুরূপ-দর্শনজনিত দুঃখ হইতেও মুক্ত থাকি। আবার যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরও দুই-দশটা ইন্দ্রিয় লাভ করি, তাহাহইলে আরো ততটী সুখ-দুঃখাত্মক ভাবে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, আমার সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানই পরস্পর-বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুখ কি, তাহা না বুঝিলে, দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ছোট কি, তাহা না

বুঝিলে, বড় কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে শীত বলি, নিরবচ্ছিন্ন তাহাই যদি জন্মাবধি ভোগ করিয়া আসিতাম, তাহা হইলে আর তাহাকে শীত বলিয়া বিশেষানুভব করিতে পারিতাম না। এই যে ভূবায়ু অবিচ্ছেদে আমার স্কন্ধে মহা ভার চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কি আমি টের পাই? পৃথিবী যে আমাকে তাহার আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে মহাবেগে অবিরাম ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই কি আমি অনুভব করিতে পারি? নিবিড় নীরদাবৃত অমা-রজনীতে যখন "তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল" তখন কোন রূপই দর্শন করি না; কেবল পূর্ব্বানুভূত আলোকের বিপরীত একমাত্র অন্ধকারের ভাব মনে পড়ে; কিন্তু যদি জন্মান্ধ হইতাম, তাহা হইলে আলোকেরও জ্ঞান না থাকায়, আমার মনে উহার স্বতঃ-সাপেক্ষ অন্ধকারেরও কোন ভাব প্রতিভাত হইত না। এইরূপে বুঝিতে পারি যে, আমার প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরস্পর বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্যই মুনিঋষিরা বলিয়াছেন, "অসতঃ সজ্জায়ত ইতি, সতো সজ্জায়ত ইতি বা।" সৎ হইতে অসতের জন্ম এবং অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়। সদসৎ দুয়ের জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার কোনটীরই জ্ঞান হইতে পারে না। পাশ্চাত্য

দার্শনিকেরাও এই ভাবকে "Co-relative idea" বলেন।

ইন্দ্রিয়পরিচয়—চক্ষুরিন্দ্রিয়

এখন ইন্দ্রিয় সকলের একবার পরিচয় করিয়া লই এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়কে ধরিয়া আলোচনা-প্রবৃত্ত হই। আমি চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা রূপ জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তাহাতে বহু অন্তরায় দেখি—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়াভিঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।

কি না, —যে দ্রব্য দেখিব, তাহা যদি চক্ষু (১) হইতে অত্যন্ত দূরে (২) অথবা চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে থাকে, তবে তাহার রূপ দেখা যায় না। (৩) চক্ষুর কোন প্রকার বিকার হইলে (৪) অথবা মন অন্য বিষয়ে ডুবিয়া গেলে আমি চক্ষুতে কিছু দেখি না। যে দ্রব্যটী দেখিব তাহা যদি (৫) অতি ক্ষুদ্র হয় কিম্বা দ্রব্যান্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। আবার (৭) সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের ন্যায় প্রবল রূপের ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণালোক ডুবিয়া গেলে অথবা (৮) একই রকমের দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলে, আমি দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ দেখিতে পাই

না। ইহা ছাড়া (৯) দ্রষ্টব্য পদার্থটী আদ্যন্তহীন হইলে অথবা (১০) দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলে, তাহার রূপ দেখা যায় না। আমি যখন শান্ত হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুরন্ত্রের এই সকল অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, কেমন অপদার্থ শম্বুক ছুটীকে আমি কেমন অযথারূপে অমূল্য রত্নজ্ঞান করিয়া থাকি। আহা কি কর্ম্মঠ সহকারী! ইনি দূরের সম্বাদ আনিবেন না; নিকটের কথাও কহিবেন না। বড়কে দেখিলে দিশাহারা হইবেন, আবার ছোট ইহার নজরে ধরে না। সত্তর-আশী বৎসরের অধিক কার্য্য করেন না, তাহার মধ্যেও কতবার পীড়ায় বিদায় লইয়া থাকেন। আর যখন প্রভু মনকে অনবস্থিত দেখেন, তখন নিজে অমনি ঘুমাইয়া পড়েন। কাজের সময় একটা সামান্ত (হাঁচি টিকটিকীর শব্দকে) ব্যবধান দেখিলে, ইহার বেদ পাঠ বন্ধ হয় এবং একটা বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইলে, ইনি ছোট খাটো কার্য্যগুলির কোন খোঁজই রাখেন না। আবার এদিকে এমনি 'নিশানসহী' যে, আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশান থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন না; অধিকাংশ-সময়েই আপনার বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া কত অযথা বিবাদের সূত্রপাত করেন। কখনও রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পান, কখনও সর্পকে রজ্জুভ্রমে

গলায় জড়ান ; দৈ বলিয়া চূণ খাইয়া মুখ পোড়ান, অন্য সময়ে চূর্ণ ভ্রমে দধি পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর এত দোষ, তবুও যে আমি ইহাঁকে এত আদর করি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইনি আমার একজন পরমাত্মীয়—আমার এই দেহাত্মবুদ্ধি-সর্ব্বস্বজীবনে মোহ-মগ্ন লোকযাত্রার সহজাত পরিচারক।

যে সকল স্থলে চক্ষু মহাশয় আমার কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা দেখা হইল। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে সকল স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় আমার রূপাদির জ্ঞান লাভের সাহায্য করেন বলিয়া মনে করি, সেই সকল স্থলে তিনি বাস্তবিকই আমার সাহায্য করেন, না আমাকে ভুলাইয়া থাকেন—একরূপ দেখাইতে অন্যরূপ দেখাইয়া দেন। চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আমরা রূপ বলি। রূপ, বর্ণ বা আলোক ইত্যাদি শব্দ একই পদার্থের অবস্থান্তর বুঝাইবার জন্য আমরা ব্যবহার করি। এই বর্ণ, রূপ বা আলোক সামান্যতঃ দুই প্রকারের ; যথা স্বকীয় রূপ বা স্বরূপ এবং প্রাপ্তরূপ বা বিরূপ। যাহা আপনার রূপেই আপনি ভাসে, তাহা স্বরূপ ; আর যাহার নিজের কোন রূপ নাই, স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থের নিকট হইতে রূপ ধার করিয়া তাহারই কতকটা রাখিয়া কতকটা

বিলাইয়া নিজের রূপবত্তার পরিচয় দেয়, তাহা বিরূপ। সূর্য্য এবং প্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। কেন না, সূর্য্য বা অগ্নি এবং চক্ষু, ইহাদের মধ্যে প্রতিকূল পদার্থান্তরের ব্যবধান না থাকিলে সূর্য্য বা অগ্নির বর্ণ, রূপ বা আলোক আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু এই বিবিধ বর্ণাম্বরা বহুভূষিতা কুসুমকুন্তলা মহীর রূপ বিরূপ; ইহার কোন রূপই আপনার নহে, সকলই ধার-করা। তাই যখন রজনীতে সূর্য্যদেব আপনার বিশ্ববিকাশক কর প্রসারণে মহীর বিশাল বক্ষদেশে বিভাসিত করিতে বিরত থাকেন, তখন মহীর এত যে হাসিভরা মুখ, তাহা কেমন ম্লান হইয়া যায়। পুনশ্চ, যদি ঘটনাক্রমে রজনীনাথ তাহার ধার-করা করগুলি মহীর ব্যথিত বক্ষে বুলাইতে না পারেন এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন গগণের একটী নক্ষত্রও যদি তাহার ক্ষীণ আলোকাধরে ধরণীর ললাট চুম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে মহীর এই চমৎকারিণী মোহিনীরূপচ্ছটা কিরূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়। সুসজ্জিত গৃহ দীপহীন হইলে তাহার সজ্জিত সৌন্দর্য্য কেমন এক গাঢ় তমসাবরণে ঢাকা পড়ে! আবার সুধাধবলিত গৃহ লোহিতালোকস্পর্শে যেমন লোহিত দেখায়, নীলালোকসমাগমে তেমনি নীলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আলোকের ইতর বিশেষে বিরূপ পদার্থের এমনই আশ্চর্য্য রূপান্তর হয়!!

আলোক এক প্রকার নহে; নীল, লোহিত, পীত ভেদে অমিশ্র আলোক সম্ভবতঃ তিন প্রকার হইলেও এই তিনের ন্যূনাধিক পরিমাণে মিশ্রণে রূপ অসংখ্য প্রকার। আলোক বা রূপ যদি বহু প্রকার না হইয়া এক প্রকার হইত, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে রূপ থাকা আর না থাকা সমান হইত। যেহেতু সে অবস্থায় আমরা রূপের কোন ভাবই স্পষ্টরূপে মনে ধারণা করিতে পারিতাম না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি অবিরত কাল অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণের এমন একখানি পট ঝুলান থাকিত, যাহার আদ্যন্ত নির্দ্দেশক বর্ণান্তর নেত্রগোচর হয় না, তাহা হইলে আমরা লোহিত বর্ণের কোন ভাবই মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতাম। সীমাবদ্ধ রূপ ভিন্ন আদ্যন্ত রূপধারণা করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। কোন রূপ দেখিতে হইলে সেই রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; তা সেই সীমা হয় রূপান্তরের দ্বারাই করি, না হয় রূপাভাব দ্বারাই করি, একই কথা। রূপাভাবও এক প্রকার রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়! কারণ, রূপাভাবও দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য এবং যাহা দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য, তাহাই রূপ। ফলতঃ যখনই আমাদের কোন রূপের জ্ঞান হয়, তখনই সেই রূপকে একটী বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং সমধরাতল ক্ষেত্রাকারে দর্শন করিয়া থাকি। চক্ষু নিজে ইহার অধিক

আর কোন আকারের রূপ আমাদিগকে দেখাইতে পারে না; তবে যে আমরা অনেক সময় চক্ষু দ্বারা ঘনক্ষেত্রাদির বা মসৃন-বন্ধুরত্বাদির জ্ঞান লাভ করি, তাহা শুদ্ধ চাক্ষুষ জ্ঞানে নহে; চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত স্পর্শজ্ঞান ভূয়ঃ সম্মিলিত হইয়া কখন কখন এক জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে অন্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়া থাকে; কিন্তু নানা কারণে স্পর্শজ্ঞান ও রূপ-জ্ঞান অনেক সময় পরস্পর অযাচিত ভাবে পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া মহানিষ্ট ঘটাইয়া ফেলে। মনুষ্যের পূর্ণ আকৃতি বুঝাইতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শনেন্দ্রিয় উভয়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সমতল ক্ষেত্রাকারে মানুষের আকৃতি দর্শন করিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহারা চারিদিকের স্পর্শানুভব করিয়া, চাক্ষুষ জ্ঞানকে কতকটা পাকা করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনেক সময় পটস্থ চিত্রিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। জন্মাবধি যাহার চক্ষে ছানি পড়া —সুতরাং যে জন্মান্ধ, হঠাৎ অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার ছানি অপনীত হইলে, সে দৃষ্টি লাভ করিয়া সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ অনুভব করে, তাহা সমুদয়ই সমতল ক্ষেত্রের, ঘনক্ষেত্রের নহে। সে ব্যক্তি যে সকল পদার্থকে অগ্রে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানিত, এখন সেই সকল পদার্থকে তাহার

সম্মুখে দূর-নিকট করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, শুধু চক্ষুর, দ্বারা সে তৎসমুদয়কে সমদূরবর্ত্তী এবং সমতল ক্ষেত্রাঙ্কিত জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলতঃ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন ঘনক্ষেত্রের বা কোন পদার্থের দূরাদূরত্বের জ্ঞান চক্ষু নিজে জন্মাইতে পারে না। অনন্ত আকাশের দূরাদূর প্রদেশ ব্যাপিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত উজ্জ্বল গোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা আমি সে সকলকে যেন সম-দূরবর্ত্তী উজ্জ্বল থালের ন্যায় সমতল ক্ষেত্রবৎ দর্শন করিয়া থাকি।

চক্ষু দ্বারা আমি বর্ণ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও দোষ আছে। কি স্বপ্রকাশ, কি উপপ্রকাশ, সকল পদার্থ হইতেই তাহাদের রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই রূপ-তরঙ্গ পদার্থান্তরে সঞ্চারিত হইয়া কতক তাহাতে শোষিত, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া নিতান্ত জটিল এক তরঙ্গাকারে আমাদের চক্ষে প্রতিহত হয়; সুতরাং কোন্ পদার্থের কোন্ টুকু নিজস্ব, আর কোন্ টুকু পরস্ব, তাহার নির্ণয় হইয়া উঠে না। অপিচ সহজ দৃষ্টিতে বা দুর-দৃষ্টিতে যে বর্ণকে অবিচ্ছিন্ন একই বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়, যন্ত্রযোগে বা নিকটে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে একাধিক বর্ণের সংঘাত বলিয়া বুঝা যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা শোণিত দর্শন করিলে, আর তাহাকে পুর্ব্বের

মত অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণ দেখায় না, জলীয় পদার্থ মধ্যে লোহিত ও শ্বেত কণাসমূহ ভাসমান থাকা দৃষ্ট হয়। স্যাণ্টেনাইন (Santonine) প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বা "কামলা" প্রভৃতি অন্যান্য কারণে এমন কখন কখন হইয়া থাকে যে, এত দিন যে সকল বস্তুকে ধবল দেখাইয়াছিল, সেই সকল পদার্থকে তখন হরিদ্রাবর্ণাভ দেখায়। দৃষ্ট-পদার্থের এই বর্ণ-পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ আমার চক্ষুরই এমন একপ্রকার পরিবর্ত্ত, যাহার জন্য আমি বাহ্যরূপ মাত্রকে হরিদ্রাবর্ণাভ দেখিতে বাধ্য হই। আমার চক্ষুর এই পরিণতিকে আমি একপ্রকার রোগ বলি; কিন্তু তাহা রোগ হইলেও প্রকৃতির নিয়মাধীন এক প্রকার স্বাভাবিক অবস্থা এবং পীতনেত্র আমার জীবনের সহচর হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যদি সকল মনুষ্যেরই জন্মাবধি মৃত্যু-পর্য্যন্ত এই প্রকার চক্ষু হইত, তাহাহইলে, এখনকার প্রত্যেক ধবল পদার্থকে সকলেই হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্রকাশ পদার্থের বর্ণের ইতর বিশেষে-অপ্রকাশ-পদার্থের বর্ণান্তর ঘটে; এখন দেখা গেল যে, কি স্বপ্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর হওয়া আমাদের চক্ষুরই পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর ভাবান্তরে সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর ঘটে।

পদার্থসকলের বর্ণান্তর হওয়ার প্রস্তাব উপলক্ষে আর একটী কথা বলিয়া রাখিব। নানাবর্ণরঞ্জিত একখানি পট অত্যন্তবেগে ঘুরাইলে পটখানিকে আর বিবিধ বর্ণাঙ্কিত বলিয়া বোধ হয় না, একই বর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং অবস্থাবিশেষে অতবেগসঞ্চরমাণ পটকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। ফলতঃ বাহ্যবস্তুর যদি প্রকৃত কোন রূপ থাকে, সে রূপ আমরা জানিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র বিকৃত রূপ দেখিতে পাই এবং তাহাকেই প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তুষ্ট হই। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ রূপ আমাদের জ্ঞানাতীত; কেবল সাপেক্ষ রূপই আমাদের জ্ঞেয় এবং তাহা জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই।

আমরা সকল পদার্থের রূপের সত্তা স্বীকার করি, কিন্তু চক্ষু মহাশয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তেজস্তন্মাত্র-রূপের পরগত স্পর্শতন্মাত্রবায়ুর প্রভা বা রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এটী অবশ্য আমাদের একটী স্থূল ভ্রম নহে। যদি অন্যান্য জড়সত্তার রূপ থাকে, তবে বায়ুরও অবশ্য প্রভাত্মীত একরূপ রূপ আছে। তবে যে অপরাপর বস্তুর প্রভাগতরূপের ন্যায় আমরা সাধারণতঃ বায়ুর কোন রূপ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ পরিষ্কার। কোন পদার্থের রূপ দেখিতে হইলে, সেই পদার্থকে চক্ষুর সহিত

একবারে সংলগ্ন না রাখিয়া একটু দূরে রাখিতে হয়; কিন্তু বায়ুকে আমরা চক্ষু হইতে দূরে রাখিতে পারি না এবং সেই জন্য তাহার রূপ দেখিতে পাই না। যে অবস্থায় অপরাপর পদার্থের রূপ দেখি, সেই অবস্থায় স্বনেত্র-প্রতিহত তেজঃ বায়ুতে আরোপিত করিয়া বায়ুরও রূপ দেখা যায়! যে অবস্থায় বায়ুর রূপ দেখিতে পাই না, সে অবস্থায় অন্য কোন বস্তুরও রূপ দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুর পাতা বা চক্ষুর কি রূপ, তাহা স্বচক্ষে আমরা দেখিতে পাই না; কেন না তাহারা দৃষ্টিকেন্দ্রাপেক্ষা চক্ষুর অধিকতর নিকটে থাকে। পুনশ্চ, আমরা যে বায়ুর রূপ একেবারে দেখিতে পাই না, তাই বা কি করিয়া বলি? দিবসে সূর্য্যের আলোক এবং রাত্রিতে চন্দ্রের আলোক বায়ুর অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বাঙ্গে কিয়দংশ আশোষিত এবং কিয়দংশ তাহাহইতে প্রক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশই বায়ুভেদ করিয়া বাহির হওয়ায়, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় স্বচ্ছরূপ উৎপাদন করে, যাহা আমরা অনুভব করিয়াও প্রকাশ করিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারি না এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রযুক্তই তেজস্তন্মাতীত বায়ুর রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করি না। অবশ্য রূপতন্মাত্র তেজস্তন্মা-তীত বায়ুর নিজের কোন রূপ নাই, কিন্তু এক পক্ষে ধরিতে গেলে পৃথিবীর কোন্ পদার্থইবা নিজের রূপে রূপবান?

দিবসে সৌরকর স্পর্শে যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সূর্য্যালোক ধারণ করিয়া বাহ্যতঃ এক এক নির্দ্দিষ্টরূপ ধারণ করে, যাহার সহিত আর সকলের রূপের প্রভেদ বুঝিতে পারি, তেমন অন্ধকার রজনীতে যখন আলোকাভাবে বিশ্বচরাচরের রূপ ফুটিতে পারে না, তখন বায়ুও হৃতরূপ বা স্বস্বরূপাবস্থিত হয়। যদি বায়ুর আলোকসমাগমে রূপময় হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহাহইলে দিবারাত্রভেদে বায়ু-প্রতিফলিত প্রভাব বায়ুর এইরূপ ভেদ সম্ভব হইত না। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বায়ুও আলোকসংসর্গে সেই এক অপরূপ স্বচ্ছরূপে রূপবান্ হইয়া থাকে, যাহা আমরা বুঝিয়াও সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না। বায়ুর স্বচ্ছরূপ না থাকিলে আমরা কি স্বপ্রকাশ, কি পরপ্রকাশ, কোন বস্তুরই রূপ দেখিতে পাইতাম না—সকলেরই রূপের তরঙ্গ বায়ুর বাহ্যাঙ্গে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তাহা কখনই আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধের অন্তর্গত হইতে পারিত না। কাচ, জল এবং আরও কতকগুলি জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছ; অনেক সময় আমরা বায়ুর রূপের ন্যায় ইহাদেরও রূপ দেখিতে পাই না, আবার যেমন অবস্থানভেদে এই সকল স্বচ্ছপদার্থের রূপ দেখিতে পাই, তেমনই অবস্থানভেদে বায়ুরও রূপ

দেখিতে পাই। জলমধ্যে যখন খণ্ডিত বায়ু বুদ্বুদ আকারে উঠিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিকস্থ জলের রূপের দ্বারা সীমাবচ্ছিন্ন হওয়ায় সেই বায়ুগোলকের রূপ জলপ্রভানুবদ্ধিভাবে কেমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই!

চক্ষুদ্বারা সচরাচর গতি-জ্ঞানও আমাদের হয়। কিন্তু ইহাতেও আমরা অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়া থাকি। গতিশীল তরণী বা অন্য কোন যানে বসিয়া থাকিয়া অনেক সময় আমরা যান এবং আমাদিগকে গতিহীন এবং চতুর্দ্দিকস্থ গতিহীন পদার্থসকলকে গতিশীল জ্ঞান করিয়া থাকি। মেঘাচ্ছাদিত আকাশের গতিশীল মেঘকে গতিহীন মনে করিয়া, গতিহীন চন্দ্রকে গতিশীল জ্ঞান করি। নিত্য তীব্র গতিশীলা পৃথিবীকে অচলা মনে করিয়া, অচলপ্রায় সূর্য্যকে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে দেখি। কোন চক্র যখন ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই, কিন্তু যখন চক্রটী অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সেই ঘূর্ণন দেখিতে পাই না। একখানি যষ্টির দুই প্রান্তে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া যদি কেহ সেই যষ্টিকে বেগে ঘুরাইতে থাকে, সেই ঘূর্ণিত আলোকদ্বয়কে একটি গতিহীন আলোকচক্রের আকার ধারণ করিতে দেখি। বস্তুতঃ সুধু চক্ষুদ্বারা আমরা গতি নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রায়ই গতিশীলকে গতি-

হীন এবং গতিহীনকে গতিশীল মনে করি। কতকগুলি পদার্থ—যাহাদিগকে আমরা স্থির মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপেক্ষিক ভাবে স্থির ভিন্ন নিরপেক্ষ স্থির নহে; পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতে কোন পদার্থই নিরপেক্ষভাবে স্থির নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা স্থির মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অস্থির বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে কোনরূপ গতি অনুভব করিতে না পারিয়া, যে পৃথিবীর নাম রাখা হইয়াছে অচলা, সেও অবিশ্রামে মহাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অন্যে পরে কাকথা! পৃথিবী স্থির নহে, সুতরাং পৃথিবীর পৃষ্ঠে যত কিছু আছে, কেহই স্থির নহে। তবে যে আমরা কাহাকেও স্থির—কাহাকেও অস্থির বলি, তাহা কেবল অস্থিরতার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকি। গতিশীলা পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া এবং পৃথিবীর গতিতে সমান গতিশীল পার্থিব পদার্থ সকলের সাধারণ গতি গণনায় না আনিয়া, তাহাদের বিশেষ গতি-স্থিতির তারতম্য করিয়া কাহাকেও গতিশীল—কাহাকেও গতিহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ গতিহীন নহে।

চক্ষুদ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করি, কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ সংখ্যার জ্ঞান নহে। চক্ষুর গঠনের ইতর-বিশেষে রূপজ সংখ্যা-জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। আমাদের চক্ষু যদি বর্ত্তুল না হইয়া চক্রাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচ খণ্ডবৎ হইত, তাহাহইলে একই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রত্যেক খণ্ডে পতিত হইয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যানুসারে বিম্ব-পদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান হইত এবং আমরা কোন একটী বস্তুকে এখনকার মত একাকৃতিগত না দেখিয়া বহ্বাকৃতিগত দেখিতাম। পুনশ্চ আমাদের দুইটী চক্ষু এবং সাধারণতঃ দুইচক্ষুদ্বারা একমাত্র রূপ দর্শন করি, কিন্তু চক্ষু দুইটী যে আকারে গঠিত ও বিন্যস্ত, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের অবস্থানভেদ জন্মাইয়া সকল বস্তুকেই যুগলমূর্ত্তিতে দেখিতে পারি। যদি চক্ষু দুইটীকে সহজভাবে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে দূর বা নিকটের কোন দ্রব্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দ্রষ্টব্যকে দেখিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে যুগলমূর্ত্তিতে দেখা যায়। আমার এই যুগলমূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তুটীকে যদি ক্রমে নিবদ্ধ লক্ষ্য পদার্থের দিকে সরাইয়া আনা যায়, তাহাহইলে যুগলের মধ্যের অন্তর ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে লক্ষ্যস্থানে যুগলত্ব একেবারে অন্তর্হ্ত হয় এবং যুগলমূর্ত্তি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। অপর,

নাসিকামূলের দুই পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী রাখিয়া অঙ্গুলীদ্বয়কে দেখিতে গেলে দুটী অঙ্গুলী মিলিত হইয়া একটী স্থূল অঙ্গুলীর মত দেখায় এবং একত্বভাবাপন্ন সেই অঙ্গুলী দুইটাকে নাসিকামূল হইতে দূরে লইলে, আবার তাহাদের একত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বিত্ব প্রকাশিত হয়। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ চসমার কাচ দুই খানিকে একখানি বৃহৎ কাচ বলিয়া জ্ঞান হয়। মানব চক্ষু এইরূপ গঠিত ও বিন্যস্ত না হইয়া যদি এমন ভাবে গঠিত ও বিন্যস্ত হইত যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমরা সম্মুখস্থ প্রত্যেক মূর্ত্তিকে বহ্বাকৃতিগত দেখিতে বাধ্য হইতাম, তাহাহইলে আমাদের তদবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হইত!

চক্ষুদ্বারা আমরা সকল পদার্থের আয়তনও স্থির করিতে যাই এবং তাহাতেও বিস্তর ভ্রমে পড়ি। চক্ষুর বর্ত্তুলত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে একই দৃষ্টবস্তুর আয়তনের এবং দূরাদূরত্বের ইতর বিশেষ হয়। আবার একই পদার্থ-দূরাদূর-ভেদে একবার ছোট একবার বড় দেখায়। অতএব চক্ষুদ্বারা কোন বস্তুর নিরপেক্ষ আয়তন স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য কত ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়! একটী

টাকাকে চক্ষুর সঙ্গে লাগাইয়া ধরিলে, তাহাকে একবারেই দেখা যায় না; ক্রমে চক্ষু হইতে দূরে লইতে থাকিলে, কোন এক স্থানে তাহাকে দেখা যায় এবং সেই স্থান হইতে যতই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, টাকাটীর আয়তন ততই ক্ষুদ্র হইতে থাকে; অবশেষে এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেখা যায় না। একই বস্তু যখন নিকটে আসিলে বড় দেখায় এবং দূরে যাইলে ছোট দেখায়, তখন সুধু চক্ষুর সাহায্যে কোন পদার্থের প্রকৃত আয়তন জানিবার উপায় নাই। ফলতঃ চক্ষু মহাশয় তাঁহার সহজাত ভ্রাতাদের সহিত যুক্তি না করিয়া কাহারও আয়তনসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না এবং সকলের সহিত যুক্তি করিয়াও যাহা বলেন তাহা যে প্রবঞ্চনাময়, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না!

চক্ষুদ্বারা দূরত্বজ্ঞানও আমাদের হয়, কিন্তু সে জ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। দূরত্বের তারতম্যে দ্রব্যের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখায়, আবার বস্তুর আয়তনের ইতর-বিশেষে দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি বোধ হয়। যে দুইটী পদার্থকে আয়তনে সমান বলিয়া জানা থাকে, সেই দুইটী বস্তুর যাহাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে দূরস্থ মনে করি এবং যাহাকে বড় দেখায় তাহাকে নিকটস্থ জ্ঞান করি। আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র

জ্বলিতেছে, ইহাদের কে নিকটে, কে দূরে অবস্থিত, আর কেই বা বড়, কেই বা ছোট, তাহার মীমাংসা চাক্ষুষ জ্ঞানসাধ্য নহে। তবে সকলকে সমান দূরস্থ মনে করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের এবং সকলকে সমানায়তন বলিয়া ধরিয়া তাহাদের আপেক্ষিক দূরাদূরত্বের এক অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি; মূলে কিন্তু দূরাদূরত্বের বা আয়তনের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের নিশ্চিতাবধারণা না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কে ছোট, কে বড়, আর কে দূরে, কে নিকটে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একটা চিত্রের সমালোচন করিতে যাইয়াও আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করি। এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে একটা নগর কল্পনা করিতে পারি, তিল প্রমাণ একটা প্রতিকৃতি তাল প্রমাণ দেখিতে পাই। একই সমতলক্ষেত্রগত বিবিধ বর্ণসংঘাতকে দূরাদূরসন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করি। এ সকল আমাদের দৃষ্টিভ্রমেরই কার্য্য।

দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থকে আমরা যে স্থানে দর্শন করি, তাহাও নিরপেক্ষ স্থান নহে। দুই চক্ষুদ্বারা যে পদার্থকে যে স্থানে দেখা যায়, এক চক্ষুদ্বারা তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না; হয় এ পাশে না হয় ওপাশে সরিয়া থাকা বোধ হয়। আবার জলতলস্থ কোন পদার্থকে যেমন তাহার প্রকৃত

স্থান হইতে চতুর্থাংশমিত উপরিস্থ জ্ঞান হয়, তেমনই স্বচ্ছ বায়ুজগতের বায়ুস্তরের গাঢ়ত্ব তারতম্যানুসারে যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রূপ দেখায়। সেই জন্য প্রৌঢ় সূর্য্যাপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধ অরুণ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং সাধারণতঃ দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়াও অস্ত ও উদয়কালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের নিবাস নিশ্চয় করিতে যাইয়া আমরা আরও কত কৌতুকাবহ ভ্রম করি। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান অতি উচ্চরবে বলিয়া দিতেছে যে, চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া যেমনই না বুঝ, আকাশে জ্যোতির্ম্ময় দেহ যে সকল খগরাজ উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের কেহ কেহ পৃথ্বী হইতে এতদূরে আছে যে তাহাদের সংবাদ লইয়া আমাদের কাছে আসিতে সেকেণ্ডে ১৮৬৩০০ মাইল হাটিয়াও রশ্মি দূতগণকে দু-চারি-ছয় বর্ষ শতাব্দী বা যুগকাল পথে প্রবাস করিতে হয়। সুতরাং ভ্রাম্যমাণ খগকুলের যে ঠিকানায় সংবাদ লইয়া রশ্মিদূত রওনা হয়, আমাদের কাছে পৌঁছিবার সময়ে খগরাজ সে ঠিকানায় থাকিতে পারে না। আর এমনও হইতে পারে যে দূতবর আমাদের নিকট পৌঁছার পূর্ব্বেই খগরাজ দূত বর্ণিত ঠিকানা ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে। আমরা হয় ত তাহার

আদ্য শ্রাদ্ধের শোকাভিনয়ের দিনে তাহার শুভ অন্নাশনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছি!! আবার যে স্থানে আমরা কাহাকেও দেখিতেছি না, ঠিক সেই স্থানেই কোন খগরাজ বিরাজ করিতেছে—কেবল দূত মুখে সংবাদ পাইতে আমাদের বিলম্ব হইতেছে বলিয়া আমরা তাহাকে সে স্থানে বসিতে দিতেছি না!! ফলতঃ পরিদৃশ্যমান নভঃ প্রাঙ্গণের যে চিত্রটী দেখিতেছি—অর্থাৎ খগকুলের পরস্পর দূরাদূরে বামদক্ষাবস্থানের যে সংবাদটী এই মুহূর্ত্তে পাইতেছি, ঠিক তেমনি সংস্থিতি তাহাদের কোন দিনই ঘটে নাই। যদিও এইমাত্র সভার সংবাদ পাওয়া গেল তথাপি আগত পত্রিকাগুলির রওনা হইবার ভিন্ন ভিন্ন তারিখ ধরিয়া হিসাব কসিলে প্রতিপন্ন হয় যে পথে পত্র-বাহকদের কাহারও মুহূর্ত্ত কাহারও শতাব্দী, স্বল্পবিস্তর কাল বিলম্ব ঘটায় আজিকার এই দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে কোন অতীত দৃশ্য নহি। পরন্তু নানা সময়ের নানা সভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমাবেশে একটী কৃত্রিম দৃশ্য মাত্র !!! হায় দেশ কাল পাত্র মহাশয়েরা একটী দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে কেমন ঠকাইতেছে !!

চক্ষুর সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রূপ দেখিতে পাই। সেই রূপ গুলিকে আমার

এবং আমার পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু যে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে অনুভব করিতে পারি না, সে স্থলে প্রতিবিম্ব সকলকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভ্রমের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া যাদুকর সকল আমাদিগকে কাটামুণ্ডের কথা শুনাইয়া থাকে এবং আরও কত প্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখায়। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞানটী পাওয়া যায়, তাহাতে যে কোন অলীকতা আছে, চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না। তবে যখন হাত বাড়াইয়া আমরা দর্পণের ক্রোড়স্থ প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট বস্তু সকলকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না এবং দর্পণের পৃষ্ঠের দিকেও অনুসন্ধান করিয়া যখন কিছু দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, প্রত্যুত যখন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তু সকলকে সরাইলে তাহার ক্রোড়স্থ বস্তু সকলও অদৃশ্য হয়, আর বিম্বা সকলকে স্পর্শ করিলে, প্রতিবিম্ব সকলকেও স্পর্শ করার মত দেখায়, তখন আমরা অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ বস্তুর রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে। দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে, তথাচ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। যে সকল যুক্তি মূলে অন্যান্য বাহ্য বস্তুর রূপানুভব করি; রূপাধার বস্তুর অনুমান করি, প্রতিবিম্বের বাস্তবিকতা

সম্বন্ধেও সে সকল যুক্তি না খাটে, এমন নহে। প্রতিবিম্বকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, বিম্বকে স্পর্শ করিয়া প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বকেও স্পর্শ করিতে পারি। বিম্বের রস, গন্ধ যেমন অনুভব করি, প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বের রস-গন্ধও তেমনি অনুভব করিতে পারি। বিম্ব বর্ত্তমান থাকিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি, কিন্তু বিম্ব সরাইলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায়; কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবিম্বকে অলীক অবাস্তবিক বিবেচনা করিবার কি আছে? আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাহারও রূপ ভিন্ন রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি কিছুই অনুভব করিতে পারি না, সেইরূপও নানা কারণে নানা সময় দেখিতে পাই না, তবুও তাহাদের সত্তার বাস্তবিকতা অস্বীকার করি না, কিন্তু জলমধ্যে তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার বাস্তবিকতা অস্বীকার করি।

চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। যাবতীয় পদার্থের প্রতিবিম্ব চক্ষুরূপ দুই খানি দর্পণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পতিত হয়। বিম্বনিঃসৃত সে সকল রূপ-রেখা এক চক্ষুতে পড়ে, সে সকল রূপ রেখা, অপর চক্ষুতে পড়ে না। বিম্ব হইতে অসংখ্য রূপ-রেখা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারই কতকগুলি এক চক্ষুতে এবং কতকগুলি অন্য চক্ষুতে পড়িতেছে। চক্ষুর সম্মুখে দূরাদূর

বস্থিত অনেক পদার্থ রহিয়াছে এবং সেই সকলের প্রত্যেকটী হইতেই ঐরূপ দুইটী স্বতন্ত্র আলোকধারা চক্ষুতে পড়িতেছে। সেই সকল বহুরূপিণী আলোকধারা চক্ষুতে পড়িবার পূর্ব্বে পথে পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে এবং চক্ষুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্রায়তন একটী সমতলক্ষেত্রে সংগৃহীত হইতেছে! চক্ষুমধ্যে সংগৃহীত হইতেছে, তাই কি সোজাভাবে? তাহাও নহে; বিপর্য্যস্ত ভাবে সংগৃহীত হইতেছে; এরূপ অবস্থায় উভয় চক্ষুতে, অতি ক্ষুদ্রায়তন স্থানে সমতলক্ষেত্রে, বিপর্য্যস্ত ভাবে, যে সকল বর্ণময় ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা হইতে বৃহদায়তন, দূরাদূরস্থ অবিপর্য্যস্ত এবং ঘনক্ষেত্রাকার বিম্বের রূপ দেখিয়া থাকি। চক্ষুতে পড়ে দুইটী প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি একটী বিম্ব! চক্ষুতে পড়ে সর্ষপায়তন প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি তালপ্রমাণ বিম্ব, চক্ষুতে যে প্রতিবিম্বের মাথা নীচে থাকে, তাহারই বিম্বের মাথা দেখি উপরে! চক্ষুতে সকল প্রতিবিম্ব এক সমতলে থাকে, বাহিরে তাহাদিগের বিম্ব সকলকে অসমতলে দূরাদূরস্থ বলিয়া মনে করি! প্রতিবিম্ব সকল থাকে সমতলক্ষেত্রাকারে, আমরা বিম্ব সকলকে দেখি ঘনক্ষেত্রাকারে! প্রতিবিম্ব পড়ে এক বর্ণের, বিম্বকে দেখি আর এক বর্ণের! বামচক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি এক স্থানে, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি অন্য স্থানে,

উভয় চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি মধ্যস্থানে! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং!

রূপের জ্ঞান কেবল দর্শনেন্দ্রিয় সাপেক্ষ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় রূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। রূপসম্বন্ধে চক্ষু যে টুকু বলিতে পারে, তাহা তাহার বাহ্যাস্তিত্বের জ্ঞাপক নহে। চক্ষুরন্তর্গত প্রতিবিম্ব এবং বহিঃস্থ বিম্বে আকৃতিগত, অবস্থানগত, বর্ণগত, সংখ্যাগত বিভিন্নতা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বকে আমি কোনরূপে অনুভব করিতে পারি না, অথচ সেই অননুভূত অসত্য প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত বহিঃস্থ বিম্বরূপের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি!! বস্তুতঃ রূপ-জ্ঞানটী ঐন্দ্রিয়িক, কিন্তু রূপের বাহ্যাবস্থানগত জ্ঞান সমস্তই আনুমানিক—সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

চক্ষু মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার পর শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মহাশয়ের পরিচয় দিব। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা নিরপেক্ষরূপ দর্শন করিতে পারি না; কর্ণদ্বারা নিরপেক্ষ শব্দই কি আমরা শুনিতে পাই? কখনই না। একটা হাটে শত শত লোক

কথা বলিতেছে:—কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ দর জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ দর বলিতেছে, কোথাও মারামারি, কোথাও কাড়াকাড়ি, কোন স্থানে ছাগগণের ক্ষীণরব, স্থানান্তরে বলীবর্দ্দের গভীর নিনাদ, আমি প্রায় তিন ক্রোশ দূর হইতে এ সকলের কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ক্রমে যতই সেই হাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, ততই ক্রমে কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছি:—প্রথমতঃ অতি অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ, তাহার পর কিঞ্চিৎ স্ফুট একটা হৈ চৈ শব্দ, তাহার পর আরো কিছু অগ্রসর হইয়া নানা-প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একই প্রকারের শব্দ কেবল দূরত্বভেদে আমার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিঘাত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আকাশ সমুদ্রে অসংখ্য শব্দতরঙ্গ ছুটিতেছে তাহাদের পরস্পরের ঘাত প্রতি-ঘাতে কোন তরঙ্গ লুপ্ত, কোন তরঙ্গ স্ফুট হইতেছে এবং তাহার পরিণামে যে এক মিশ্রিত তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে তাহাই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে। কোলাহল-ময়ী এই পৃথুলবক্ষা পৃথিবী প্রবলবেগে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এ কি নিঃশব্দে? আমার শরীরের অভ্য-ন্তরে রসরক্তাদি অসংখ্যপথে খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, এ কি নিঃশব্দে? ভক্ষিত পদার্থ সকল আমার জঠরাগ্নিতে

অহর্নিশি ভস্মীভূত হইতেছে, ইহাও কি নিঃশব্দে ? না তাহা নহে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশব্দ, শোণিতের সঞ্চালন শব্দ, পরিপাক-যন্ত্রের সর্ব্বপরিপাচক প্রখরাগ্নির টগবগ শব্দ, সকলেই অবিশ্রামে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে, কিন্তু আমরা বিন্দু-বিসর্গও শুনিতে পাইতেছি না ! !

যে কয় অবস্থায় চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারি না, সে কয় অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধারণা করা যায় না সুতরাং দূরত্বাদি প্রযুক্ত কর্ণদ্বারাও কিছু শুনা যায় না। ইংলণ্ডে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে তাহা আমরা শুনিতে পাই না, আবার কর্ণের মধ্যে যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাই না। কর্ণের বিকার হইলে আমি বধির হই এবং মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলেও আমি কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই না। অতি মৃদু অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে ধরে না, পাশাপাশি দুইটী কামরায় একটীতে বসিয়া অন্যে যে কথা কহে দেয়ালের ব্যবধানে আমি তাহা শুনিতে পাই না। পুনশ্চ, দশটা ঢাক যে সময়ে বাজে সে সময়ে অজাপুত্রের ক্ষীণরব কর্ণে প্রবেশ করে না এবং বহুজন এককালে এক শব্দ করিলে যে কোন শব্দ করিল তাহাও আমি নির্ণয় করিতে পারি না।

শব্দ শুনিয়া আমরা সচরাচর শব্দের উৎপত্তির দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ শুনিয়া আমরা তাহার দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। দূরত্বভেদে শব্দের ঘাত প্রতিঘাতের ন্যূনাধিক্য হয়, এই ভূয়ো দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অস্ফুট নীচ শব্দকে দূরাগত এবং উচ্চ শব্দকে নিকটাগত মনে করি। এই প্রকার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ কর্ণে শুনিয়া শব্দের উৎপত্তি স্থানের দূরত্ব ও দিক নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আমরা স্থল বিশেষে উপহাসযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের এই অসতর্কতা বা অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রেত সাধকেরা আমাদের পার্শ্বে বসিয়াই আমাদিগকে কত ভূতের শব্দ শুনাইয়া থাকে। শব্দসাধক পুরুষ আমার সম্মুখে বসিয়াই কথা বলিতেছে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইতেছে যে সে নীরবেই রহিয়াছে এবং দূরস্থ অন্য কোন স্থান হইতে অন্য কেহ কথা কহিতেছে!

দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে আমরা শব্দের উচ্চনীচতা অনুমান করি, আবার কর্ণ পটহের স্থূলাস্থূলত্ব জন্যও শব্দের উচ্চনীচতা অনুভূত হয়। আজ যতদূরের শব্দকে যত উচ্চ বোধ হইতেছে বৃদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোন কারণে কর্ণ পটহের স্থূলত্ব উপস্থিত হইলে তত দূরের তত উচ্চ শব্দকে আর

তেমন উচ্চ শুনা যাইবে না। সুতরাং শব্দের নিরপেক্ষ কোন মান থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞেয় শ্রুত শব্দের বাহ্য অস্তিত্বও জ্ঞেয় নহে। শব্দের রূপাদি কিছু নাই, সুতরাং চক্ষুঃ নাসাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। কেবল কর্ণ দ্বারাই শব্দের যা কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু কর্ণের সাক্ষ্যও অস্পষ্ট। শব্দ অনুভব করিবার পূর্ব্বে তাহা বাহিরে ছিল কি না এবং বাহিরে থাকিলে কি আকারে ছিল এবং আমার কর্ণে কি আকার ধারণ করিল ইহা বুঝা যায় না। তবে শব্দের অপরিচিত রূপ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বুঝিয়া থাকি। দূরে একটী মনুষ্যরূপীকে ওষ্ঠ প্রকম্পন করিতে দেখিলাম। আর তাহার একটু পরেই একটা শব্দ শুনিলাম। সেই প্রকার ওষ্ঠ কম্পন যথনই দেখি তথনই একটু পরে সেই প্রকার শব্দ শুনি। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে ঐ দূরস্থ ওষ্ঠ কম্পন হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ণে সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠ কম্পন হইল দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আর শব্দ হইল শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; এরূপ অবস্থায় ওষ্ঠ কম্পনের সহিত শব্দানুভূতির কার্য্যকারণসম্বন্ধ কাল্পনিক ব্যাপার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ

অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান নহে, অনুমান সিদ্ধ কাল্পনিক জ্ঞান মাত্র।

পুনশ্চ, যদি মনে করাও যায় যে ওষ্ঠ কম্পন জন্য বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইয়া শব্দের জ্ঞান জন্মায়, তাহা হইলেও শব্দকে বাহ্যবস্তু-বা বাহ্যবস্তু-নিষ্ঠ কোন গুণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; কেন না শব্দ যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ আর তাহার শব্দত্ব জন্মে না। পূর্ব্বে যাহা কি রকম কি একটা আন্দোলন-রূপে থাকে, তাহা কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইলে শব্দরূপে পরিণত হয়। বাহিরে যাহা ওষ্ঠ কম্পন, পরে বায়ু সমুদ্রে তথাকথিত শাব্দিকাকাশের অনুমান সিদ্ধ আন্দোলন, তাহাই জীবন্ত অ-বধির মনুষ্য কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে; আমাদের দুইটী কর্ণ। যে কোনও শব্দের তরঙ্গাকৃতি উভয় কর্ণেই প্রতিঘাত হয়। একটী কর্ণে যে তরঙ্গগুলি প্রতিঘাত হয়, অপর কর্ণে তদিতর অপর কতকগুলি তরঙ্গ প্রতিঘাত হয়। সুতরাং দুইটী কর্ণে দুইটী তরঙ্গ প্রতিঘাত হইয়া যে কালে দুইটী শব্দের জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে কালে একটী মাত্র শব্দের জ্ঞান হয়। অপর একটী পদার্থে অন্য একটী পদার্থের আঘাত হইলে ঘাত ঘাতক উভয় পদার্থই গতিশীল হইয়া

উঠে। উভয়ের গতি একই দিকে হয় না। ঘাত পদার্থের গতি যে দিকে হয় ঘাতক পদার্থের গতি তাহার অপর দিকে হয় এবং আঘাত স্থান হইতে ঘাত ও ঘাতক উভয়ই দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু আঘাত স্থানে বায়ুসমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঘাত ঘাতকের দিকে নহে, চারি দিকেই অসংখ্য সরলপথে সঞ্চালিত হয়। চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত অসংখ্য তরঙ্গের কোনও তরঙ্গ পথে বাধা পাইলে আবার তাহার কিয়দংশ সেই বাধক পদার্থে বিলুপ্ত হয়, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া বিপরীত পথে গমন করে এবং অসংখ্য তরঙ্গের কোন একটির পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইরূপে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবাধিত শব্দ তরঙ্গটী অগ্রে সরল পথে এবং প্রত্যাবর্ত্তিত তরঙ্গটী পরে বক্র পথে কর্ণপটহে প্রবেশ করে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মূল কারণ এক হইলেও তরঙ্গের সরল ও বক্রপথে আগমন এবং সেই পথের দূরতার ইতরবিশেষে ধ্বনির সহিত প্রতি-ধ্বনির শব্দগত অনেক বিভিন্নতা ঘটে। এখন যদি মনে করা যায় যে চারিদিকে নানাবিধ পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত জন্য একই কালে চারি দিকে অসংখ্য বিধ তরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে একবিধ তরঙ্গ অন্যবিধ তরঙ্গের সহিত অসংখ্য অপরিজ্ঞাত স্থানে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া

কেমন এক জটিল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এই জটিল তরঙ্গ-জাত শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গের বাহ্য অবস্থান অনুভব করা কেমন অসম্ভব!

শব্দসঞ্চালক পদার্থের শব্দ-পরিচালনীশক্তির তারতম্যানুসারে শব্দের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বায়ুমধ্য দিয়া শব্দ-তরঙ্গ এক সেকেণ্ডে ১১২৮ ফিট যায়। বায়ুর শীতলতায় সুতরাং গাঢ়তায় শব্দতরঙ্গের গতি হ্রাস হয়। অপরাপর বায়বীয় পদার্থের গাঢ়তার ইতর বিশেষেও শব্দগতির ইতর বিশেষ হয়। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসে সেকেণ্ডে ৮৪৬ ফিট, অক্সিজেন গ্যাসে ১০৪০ ফিট, হাইড্রোজেন গ্যাসে সেকেণ্ডে ৪১৬৩ ফিট গতি হয়। তৈল-জল ইত্যাদি তরল পদার্থে এবং কাষ্ঠ লৌহাদি কঠিন পদার্থে শব্দের গতি বৃদ্ধি হয়। জলে সেকেণ্ডে ৪৭০৮ ফিট গতি হয়। লৌহে ১৬৮০০ ফিট, তাম্রে ১১৬০০, ওককাষ্ঠে ১০৯০০ এবং পাইন কাষ্ঠে ১৫২২০ ফিট গতি হয়। আবার এদিকে শূন্যস্থান দিয়া শব্দ অনুভূত হয় না।

কোন একটী শাব্দিকতরঙ্গমালাকে যদি পৃথগভাবে শূন্যপ্রদেশ, বায়ু, জল বা তাম্রতারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে যে তরঙ্গটী শূন্যস্থান পথে যাইবে তাহার কোন শব্দই কেহ শুনিতে পাইবে না, বায়ুপথে যে

তরঙ্গটী সঞ্চালিত হইবে তাহা শত হাতের বেশী দূরে শুনা যাইবে না, লৌহপথে সঞ্চালিত হইলে তদপেক্ষা অধিক দূরে শুনা যাইবে এবং তাড়িত তারে প্রবাহিত হইলে সাতসমুদ্র-পারেও শুনা যাইবে। সুতরাং শব্দবাহক পদার্থের ইতর বিশেষে এবং দূরত্বের তারতম্যানুসারে একই শব্দকে কখন বিলম্বে কখন অবিলম্বে শুনা যায় এবং কখন শুনা যায় কখনও শুনা যায়ও না। ইহাতে এমন হয় যে নিকটের লোক শব্দ শুনিল পরে, দূরের লোক শব্দ শুনিল অগ্রে। নিকটের লোক হয়তো যে কালে কিছুই শুনিতে পাইল না, সে কালে দূরের লোক সুন্দররূপে শুনিতে পাইল।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যে শব্দের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পদার্থের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতির হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থের সকল দেহও আবার সমান স্পন্দিত হয় না। ক্ষুদ্রায়তন স্থূল তাম্র থালিতে আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থান যেমন স্পন্দিত হয় তাহার পরিধি স্থান তেমন স্পন্দিত হয় না; আবার বৃহদায়তন সূক্ষ্ম তাম্রথালিতেও সে আঘাতে তেমন স্পন্দিত হয় না। একটী তাম্র থালীকে ধরণীর সমান্তরাল-ভাবে কোন লৌহস্তম্ভপার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া, যদি তাহার উপর বালুকা ছড়াইয়া দিয়া, থালীর এক পার্শ্বে বেহালার

ছড় ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে থালীর স্পন্দন জন্য উপরিস্থ বালুকাগুলি নাচিতে নাচিতে একটী বিশেষ জ্যামিতিক আকারে বিন্যস্ত হয়। সুতরাং ঘর্ষিত থালীর সকল প্রদেশ সমান স্পন্দিত হয় এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন জন্যই শব্দ জ্ঞান জন্মে এবং একই শব্দায়মান পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্পন্দন যদি ভিন্ন ভিন্ন রূপের হইল, তাহা হইলে শব্দায়মান পদার্থ হইতে সকলদিকে সমান প্রকৃতির শাব্দিকস্পন্দন সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না, সুতরাং শ্রোতৃ-গণের দেশ-কাল-পাত্রভেদে তথা কথিত একই শব্দতরঙ্গ দ্বারা একই শব্দ জ্ঞান হইবার কথা নহে। অথচ সচরাচর শব্দায়মান পদার্থের একত্বে আমাদের দশজনের কর্ণগত শব্দের একত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি!!

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

রূপ ও শব্দের এবং তাহাদের অনুবোধক ইন্দ্রিয় মহাশয়দিগের পরিচয় দিলাম এখন গন্ধ এবং তদনুভাবক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিব। গন্ধ এক প্রকার অনুভূতি যাহা আমরা নাসিকাধিষ্ঠিত* ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি।

গন্ধের পরিচায়ক ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিচয় দেয় গন্ধ। সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ের মত ইহাদেরও একটীর জ্ঞানাভাবে অন্যটীর জ্ঞান হয় না। আবার ইহাদের একের পরিচয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় তাহাও অনাপেক্ষিক নহে। আমি দূরস্থ গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, আবার নাসিকার অন্তর্গত শ্লেষ্মার গন্ধও পাই না। অনবরত এক গন্ধ দীর্ঘকাল অনুভব করিতে গেলে ক্রমেই সে গন্ধ ক্ষীণ হইয়া একেবারে অন্তর্হিত হয়। উগ্র গন্ধের উপস্থিতকালে মৃদুগন্ধ অনুভবে আসে না, দুইটি আস্রের মিলিত গন্ধকেও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথকরূপে অনুভব করা অসাধ্য। ফলতঃ আমরা প্রায়ই প্রকৃত গন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি এবং প্রতিনিয়ত যাহা নাসাপথে আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করিতেছি তাহার কি গন্ধ তাহা জানিতে পারি না। এবং নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বায়ুর গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু যদি অন্যান্য পদার্থের গন্ধ থাকে তবে বায়ুর যে কেন গন্ধ থাকিবে না ইহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে বায়ুর রূপ থাকা অস্বীকার করা হয় সেইরূপ কারণে বায়ুর গন্ধও অস্বীকার করা হয়। বায়ু সর্ব্বদাই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যাঙ্গের সহিত

সংযুক্ত থাকে বলিয়া আমি বায়ুর গন্ধ অনুভব করি না। পুনশ্চ, অন্যপ্রকার যে গন্ধ অনুভব করি, সকলই বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে। এরূপ অবস্থায় বিবিধ গন্ধসংযুক্ত বায়ু ভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ কখনই ঘটে না। সুতরাং প্রতিকূল ধর্ম্মবিশিষ্ট অসংখ্য গন্ধানু মিলিত হইয়া পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে কোন গন্ধানু জড়িত হইয়া যে এক যৌগিক গন্ধানু সংঘটিত হয় তাহাই আমার অনুভবে আসে। এই মিশ্রিতগন্ধ অনুভব করিয়া বলা যাইতে পারে না যে আমি যে গন্ধ অনুভব করিতেছি ইহাতে বায়ুর গন্ধাংশ অথবা সম্মুখস্থ অন্যান্য কোন পদার্থের গন্ধাংশ নাই।

আমি গন্ধ অনুভব করি কিন্তু গন্ধানুর কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুভব করি কি? গন্ধানুর না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ। দশ হস্ত দূরে একটী পক্বাম্র রহিয়াছে এবং সেই আম্র হইতে কি না কি একটী আসিয়া আমার নাসাপথে যায়, আর তাহাতে আমি সেই আম্রের গন্ধানুভব করি!! সেই যে কি একটা কি যাহাকে গন্ধানু বলি তাহাকে দেখিতে শুনিতে চিবাইতে বা ছুঁইতে পারি না। তাহার পর সেই অপরিচিত গন্ধাণুকে আমার এক এক অবস্থায় এক

একরূপ অনুভব করি। আমার সর্দ্দি লাগিলে সে আম্রের গন্ধ পাই না অথবা অন্যরূপ গন্ধ পাই। পুনশ্চ আমি পলাণ্ডু লশুনের গন্ধকে এক সময়ে নিতান্ত অপ্রীতিকর জ্ঞান করিলেও অন্য সময়ে তাহাকে অতি উপাদেয় জ্ঞান করি এবং হয়ত এলাচী কর্পূরাদি সম্মিলিত তাম্বুলচর্ব্বণে কোন সময়ে আমার মুখের যে দুর্ব্বাস হয় তাহা সেই পলাণ্ডু রশুনের সুগন্ধে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাই!!

বস্তুতঃ গন্ধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় কিন্তু গন্ধের বাহ্যাধারের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অনুমানসিদ্ধ। এবং সেই অনুমানও ভ্রান্ত দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ সুতরাং বাহ্যবস্তুর রূপানুভব করে না এবং স্পর্শের দ্বারাও বাহ্যবস্তুকে ছুঁইতে না পারে, তাহার সম্মুখে গন্ধবান্ কোন পদার্থ রাখিলে সে গন্ধানুভব করিয়াও গন্ধাধারের বাহ্যাস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে না। আবার আমার অবস্থাবিশেষে বাহ্য কোন গন্ধবান্ পদার্থ না থাকিলে গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। বৈদ্যুতিক ক্রিয়াযোগে অথবা স্বপ্নকালে আমি বহুবিধ গন্ধ অনুভব করিতে পারি। এই সকল কারণে একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি যে গন্ধাণুর বাহ্যাস্তিত্ব সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং সেই অনুমান গন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ

অজ্ঞ সুতরাং অবিশ্বাস্য রূপাদির অনুভবের উপর নির্ভর করে!!

রস ও রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় সমালোচনা করিতে যাইয়াও আমরা রসের বাহ্যাস্তিত্ববিষয়ে ভুলসিদ্ধান্ত করিয়া বসি। নিজের অবস্থার ইতরবিশেষে একই রসাণুকে আমি এক এক সময়ে এক একরূপ অনুমান করি। যখনই কোন বস্তুর রস অনুভব করি তখনই সেই রসাত্মক অণু সকলকে মুখ গহ্বরান্তর্গত লালায় মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত রসকে বিকৃত করিয়া অনুভব করি। অবিকৃত রস অনুভব করিতে পারি না, রসাণু বলিয়া কোন বাহ্যবস্তু যদি থাকে তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপগন্ধাদি হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহাদের পরিচায়ক ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ সেই অপরিচিত রূপস্পর্শের সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রসাণুর বাহ্যাস্তিত্ব অনুমান করি। রস অনুভব করি কিন্তু রসাণু অনুভব করিতে পারি না! ফলতঃ রসাণু একটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। রস অনন্ত প্রকার হইলেও সাধারণতঃ আমরা রসকে কটু অম্ল লবণ তিক্ত কষায় মধুর ভেদে ছয় প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার রসনায় তিক্ত তাহা হয়তো বালক বা বৃদ্ধ কিম্বা অন্য জীবের রসনায় মিষ্ট বা কষায় জ্ঞান হইতে পারে। যাহা আমার

নিকট কটু তাহা গবাদির নিকট মধুর হইতে পারে। সুতরাং প্রাণী সকলের অবস্থা বিশেষে আমার অনুভূত রসাণুর ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের কথা বলা হইল এখন ত্বগধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা বলিব। ত্বক্ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ, ত্বক্ তেমন সীমাবদ্ধ নহে দেহের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ত্বক্ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে কিন্তু সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া নাই। স্থানভেদে ত্বকের অবস্থাভেদে সামান্যতঃ অনুভূত একই স্পর্শকে ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞান হয়। আমরা ত্বক্দ্বারা স্পর্শানুভ করি। কিন্তু স্পর্শ কি? ত্বকের দ্বারা যাহা অনুভব করি—কোন একটী পদার্থ আমাদের গাত্রস্পৃষ্ট হইলে আমরা যাহা অনুভব করি তাহা স্পর্শ। কোন পদার্থ ত্বকের সহিত সংলগ্ন হইলে আমাদের যে সকল অনুভূতি জন্মে তাহাদিগকে আমরা শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, বন্ধুরতা ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। চিন্তা করিয়া দেখিলে মসৃণাসৃণত্ব, লঘুগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতা ইত্যাদি জ্ঞান ঠিক

স্পর্শজ জ্ঞান বলিয়া বোধ হয় না, ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অধিক স্বীকার করিতেন না এবং সেই জন্য পঞ্চাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কতকগুলি অনুভূতিকে পঞ্চমেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ-রূপে ধরিয়া লইতেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আরো কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মসৃণামসৃণত্ব, লঘুত্বগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতাদির জ্ঞান ত্বকের দ্বারা না হইয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদির অন্যতম পৈশিক কুঞ্চনাকুঞ্চনাদিদ্বারা হওয়া বলেন। মনে কর, এই যে মস্যাধার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার উপরে হস্তস্থাপন করিয়াই কি ইহার গুরুত্বাদি অনুভব করা যায়? এই যে চেয়ারে বসিয়া আছি সুতরাং যাহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাহার গুরুত্ব কি চেয়ার তুলিতে চেষ্টা না করিয়া বুঝিতে পারি? তাহা পারি না এবং সেইজন্য গুরুত্বাদিকে ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক শীতাতপের ন্যায় বন্ধুরাবন্ধুরত্ব গুরুলঘুত্বাদিকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া সমালোচনা করা যাউক। রূপাদির জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিঘ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে স্পর্শজ্ঞানসম্বন্ধেও সেই সকল বাধা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হইতে স্পর্শনীয় পদার্থ ও ত্বক্ পরস্পর

সংস্পৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইয়া যদি একটী অন্যটী হইতে অধিক দূরে থাকে অথবা পরস্পর অত্যন্ত চাপাচাপি করিয়া থাকে তবে প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হয় না। দূরত্বে স্পর্শ-জ্ঞানের অভাব, অতি চাপে স্পর্শজ্ঞান ঢাকিয়া বেদনা জ্ঞান জন্মে। পক্ষাঘাত রোগে ত্বক্ বিকৃত হইলে বা মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। গাত্রে একটী কার্পাসতন্তুকণা পড়িলে তাহা অনুভবে আসে না আবার গাত্র বস্ত্রাবৃত থাকিলে মক্ষিকা পতনানুভবও করা যায় না। পুনশ্চ ঈষদুষ্ণ এবং অত্যুষ্ণ দুই খানি লৌহফলক যুগপৎ গাত্রে স্পর্শ করাইলে প্রচণ্ড উত্তাপের অন্তর্দ্দাহক স্পর্শে কদুষ্ণের মৃদুস্পর্শ কেমন ডুবিয়া যায়। আবার আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশাইয়া দিলে স্পর্শদ্বারা তাহাকে চিনিয়া বাহির করা কেমন অসম্ভব।

কি প্রকার অবস্থায় স্পর্শজ্ঞান অসম্ভব তাহা বলার পর একবার দেখা যাউক স্পর্শজ্ঞান কতদূর সত্য। স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর স্পর্শানুভব করি, কিন্তু আমা-দের চতুর্দ্দিকের ভূবায়ু যে অবিচ্ছেদে আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানুষের অসম্ভব; অবিচ্ছিন্ন রূপ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ, অবিচ্ছিন্ন গন্ধ, অবিচ্ছিন্ন রস, অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ সমুদায়ই মানুষজ্ঞানের

অতীত। ভূবায়ু যখন শরীরের চারিদিকে সমানভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন তাহার স্পর্শই আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন কেহ তালবৃন্ত হস্তে বায়ু-সাগর বিতাড়িত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন সেই বায়ুতরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া একটার পর অপরটী শরীরে ন্যূনাধিক বলে আঘাত করে আর আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমার শরীরের চারিদিকে বায়ু যে বলে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা একবার বাড়াইয়া একবার কমাইয়া না দিয়া একভাবে রাখিলে সেই অবিচ্ছিন্ন চাপ আমরা অনুভব করিতে পারি না। যেমন রূপ জ্ঞান হইতে রূপ ও রূপা-ভাবের সীমানির্ণয় করিয়া লইতে হয় তেমনি স্পর্শ অনুভব করিতেও এক স্পর্শকে স্পর্শান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। উষ্ণ স্পর্শকে শীতস্পর্শদ্বারা বা শীতস্পর্শকে উষ্ণস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, মসৃণ স্পর্শকে বন্ধুর স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, লঘুস্পর্শকে গুরুস্পর্শদ্বারা অথবা গুরুস্পর্শকে লঘুস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর; তবে শীতাতপ অনুভব করিতে পারিবে, মসৃণ বন্ধুর বুঝিতে পারিবে, লঘুগুরু জানিতে পারিবে। কিন্তু শীতোষ্ণ, লঘুগুরু, বলিয়া কোন নিরপেক্ষ গুণ আছে কি? যাহা আমার সম্বন্ধে শীত তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই শীত? বাস্তবিক নিরপেক্ষ শীত বা উষ্ণতা;

নিরপেক্ষ লঘুতা বা গুরুত্ব নিরপেক্ষ কঠিনতা বা কোমলতা, আমাদের জ্ঞানের অতীত। নিরপেক্ষ জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি নাই —তারতম্য নাই। অল্প শীত বা অধিক শীত, অল্প লঘু বা অধিক লঘু, এ সকল কথা আমরা সর্ব্বদাই প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। সেই জন্য স্পর্শজ একটী গুণকে দেশ-কাল পাত্রভেদে তদ্বিপরীত গুণের সহিত অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যাহা আমার সম্বন্ধে শীত, তাহা অন্যের সম্বন্ধে উষ্ণ, যাহা আমার সম্বন্ধে লঘু তাহা অন্যের সম্বন্ধে গুরু হইতে পারে। যাহা আমার এক অবস্থায় উষ্ণ ও লঘু তাহা আমার অন্যাবস্থায় শীতল ও গুরু বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। একখানি হস্ত অর্দ্ধফুটন্তজলে এবং আর একখানি হস্ত বরফ শীতল জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া যুগপৎ হস্তদ্বয় সাধারণ জলে প্রবেশ করাইলে বুঝিতে পারা যায় সেই একই জলের শীতোষ্ণত্ব সম্বন্ধে হস্ত দুটী কেমন বিসদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। একই জল এক হস্তের সম্বন্ধে শীতল এবং অপর হস্তের সম্বন্ধে উষ্ণ জ্ঞান হয়!! সহজ শরীরে যে পদার্থকে যত শীতল বোধ হয় জ্বরাদি জন্য শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই পদার্থকে তদপেক্ষা অধিক শীতল জ্ঞান হয়!! সুতরাং বাহ্যবস্তুর শীতাতপের ইতর বিশেষেই যে আমাদের শীতাতপ জ্ঞানের

ইতরবিশেষ হয় তাহা নহে, আমাদের শরীরের অবস্থাভেদেও বাহ্যবস্তুর শীতাতপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব শীতাতপকে কোন বাহ্যবস্তু নিষ্ঠ গুণ বলিয়া না বুঝিয়া আমাদের দৈহিক অবস্থা বিশেষ বলিয়াই বুঝা উচিত।

স্পর্শদ্বারা আমরা সচরাচর গতির জ্ঞানও লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভ্রমসঙ্কুল নহে ইহা বলা যায় না। স্পর্শদ্বারা গতির জ্ঞান হইতে প্রকৃতপক্ষে গতির জ্ঞান হয় না, হয় কেবল স্পর্শজ্ঞান শীতোষ্ণতার জ্ঞান কিন্তু আমরা ভ্রম-বশতঃ তদতিরিক্ত গতির জ্ঞানও হইয়াছে অনুমান করিয়া থাকি। তাহাতে কত সময়ে কেবল স্পর্শ করিয়া স্থির-পদার্থকে গতিশীল এবং গতিশীল পদার্থকে স্থির মনে করি। আমাদের পদস্পৃষ্টা ধরণী যে এত বেগে ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না। অন্ধকার রজনীতে সমবেগচালিতা অনান্দোলিতা তরণীতে বসিয়া কি তাহার গতি অনুভব করি? বরং গতিশীলা তরণীকে গতিহীনা মনে করিয়া আপনাকেও গতিহীন মনে করি; এবং সেই সময়ে পার্শ্বস্থ কোন স্থিরা তরণীর কোন অংশে আপনার গাত্র সংঘৃষ্ট হইলে সেই ঘৃষ্টা তরণীকে চলিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করি। ষ্টেশনে দুইখানি গাড়ী পার্শ্বাপার্শ্ব থাকিলে কখন আপনার চলিষ্ণু গাড়ীকে অচল মনে করিয়া পার্শ্বস্থ স্থির

গাড়ীকে গতিশীল জ্ঞান করি। এই সকল স্থলে আমাদের চক্ষু এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দুইই যেন যুক্তি করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া থাকে।

ঐন্দ্রিকজ্ঞান সমালোচন।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের বিষয়ের একরূপ পরিচয় দেওয়া হইল। এখন তাহারা কিরূপে পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহার সমালোচনা করিব। সম্মুখে একটী পক্কাম্র রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; আমি তাহার রূপ দেখিতেছি, সেই রূপ যেন হরিদ্বর্ণ; তাহার একটী রস অনুভব করিতেছি, তাহা অম্ল-মধুর; একটী গন্ধ অনুভব করিতেছি, তাহা সুরভি; একটী স্পর্শানুভব করিতেছি, তাহা নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল; এবং ঘাত প্রতিঘাত করিয়া তাহার একটী শব্দ শুনিলাম তাহা ধপ্ করিয়া উঠিল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে আমি একটী হরিদ্বর্ণ, একটী অম্লমধুর রস, একটী সুরভি-গন্ধ, একটী নীতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শ এবং ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্রই অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই সকল অনুভবেই আমার বিশ্বাসকে আবদ্ধ না রাখিয়া এই

সকল অনুভূতির প্রত্যেকের এক একটী আধারের বাস্তাস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেছি, অথচ সেই আধার গুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই ধরিতে ছুইতে পারিতেছি না। পুনশ্চ হরিদ্বর্ণই কি একটা অমিশ্র বর্ণ, অম্লমধুর রসই কি একটা অমিশ্র রস, মৃদুসুরভি গন্ধই কি একটা অমিশ্র গন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ মসৃণকোমলতাই কি একটা অমিশ্র স্পর্শ, ধপ্ করিয়া যে শব্দ হইল তাহাই কি অমিশ্র একটী শব্দ? যাহাকে হরিদ্বর্ণ বলি তাহাতে না জানি কতই বর্ণের সমাবেশ আছে, অম্লমধুর রসেও না জানি কতই রস মিলিত আছে। মৃদুসুরভি আম্র গন্ধটীও অমিশ্র গন্ধ নহে। নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমলতাও বহুস্পর্শের যোগফল এবং ধপ্ করিয়া যে শব্দটী হইল তাহাও বহুবিধ শাব্দিক কম্পনপ্রকম্পনের সমষ্টি। অতএব বলিতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক রূপাণু মিলিত হইয়া হরিদ্বর্ণাণু গঠিত হইয়াছে, অনেক বিপরীত ধর্ম্মান্বিত রসাণু মিলিত হইয়া অম্লমধুর রসাণু জন্মিয়াছে, অনেক বিরুদ্ধধর্ম্মী গন্ধাণু একত্র হইয়া মৃদুসুরভি গন্ধাণু হইয়াছে, বহুবিধ স্পর্শাণুসংযোগে একটি নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শাণু রচিত হইয়াছে এবং একাধিক শব্দাণু সংমিশ্রিত হইয়া একটি ধপ্ শব্দাণু সংগঠিত হইয়াছে। এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে আম্রটী

কি ? আম্রকে সাধারণতঃ একটি বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহার যে প্রধান পাঁচটী অঙ্গ দেখা যাইতেছে, হইতে পারে তাহার অসংখ্য অঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পাঁচটীমাত্র অঙ্গ দেখিতেছি বা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং আম্রের যখন ন্যূনকল্পে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ থাকা স্বীকার করা যাইতেছে এবং সেই রূপাদি বিনা আধারে থাকিতে পারে না ভাবিয়া রূপাণু, রসাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করিতেছি তখন রূপাদি পাঁচ জাতীয় অণুর সংঘাতেই আম্র প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আম্র এমন একটী পদার্থ যাহার একাংশ বহুবিধ রূপাণু, দ্বিতীয়াংশ বহুবিধ রসাণু, তৃতীয়াংশ বহুবিধ গন্ধাণু, চতুর্থাংশ বহুবিধ স্পর্শাণু এবং পঞ্চমাংশ বহুবিধ শব্দাণুদ্বারা রচিত। এই হিসাবে আম্র একটি পঞ্চক পদার্থ যাহাতে রূপাণু প্রভৃতি পাঁচ জাতীয় অণু একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে এবং এই বন্ধনই কি আম্র নহে ? সেই অপরিচিত রূপাণু, রসাণু, গন্ধাণু, স্পর্শাণু, শব্দাণু সকলে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আম্র নহে, এতৎ সকলের সেই নির্দ্দিষ্ট বন্ধনই আম্র। আম্রকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ফেলিলে তাহার অপরিজ্ঞেয় রূপরসাণু সকল পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল তাহাদের

বন্ধনটী তখন ছিন্ন হওয়ায় তাহার রূপরসাদিও অন্যরূপ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর তখন আম্র বলিয়া বুঝি না। কিন্তু সেই বন্ধনটী যে কি তাহা আমি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। সেই বন্ধনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই ; তাহা একটি মানসিক অনুমান, একটী কল্পনা স্তবক মাত্র। ফলতঃ আম্রটীর অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে, কাল্পনিক। এবং সেই কল্পনার বিশ্লেষণ করিয়া আম্রের রূপ, আম্রের রস, আম্রের গন্ধ, আম্রের স্পর্শ, আম্রের শব্দ বলিয়া থাকি।

আম্রের বাস্তবিকতার অলীকত্ব অন্য প্রকারেও বুঝা যায়। আম্রের রূপ কি ? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি ? কোনটী সিন্দুরে, কোনটী হলুদে, কোনটী ঈষৎ পীতাভ সবুজ ;— আম্র নানাবর্ণের হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্পর্শই কি আছে ? কোনটি নমনীয়, কোনটী স্থিতিস্থাপক, কোনটী কোমল, কোনটী কঠিন, কোনটী শীতল, কোনটী উষ্ণ, কোনটী বর্ত্তুল, কোনটী দীর্ঘাকৃতি, কোনটী চেপ্টা, তাই বলিতেছি যে আম্রের দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট কোন রূপ বা স্পর্শ নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে ? কোনটী মধুটুকী, কোনটী গোপালভোগ, কোনটী চিড়া ভিজানী,

কোনটী অম্লমধুর, কোনটী শূকর চেঁচানী। গন্ধও সকল আম্রের একমত নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি রস, কতকগুলি গন্ধ, কতকগুলি স্পর্শকে নানাভাগে সংমিশ্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছামত একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ কি না? একটী হইতে অপরটী রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অন্যরূপ হইলেও তাহাদিগকে একই আম্র নামে অভিহিত করিতেছ। পুনশ্চ আজ যে আম্রটীকে দেখিলে এক মাস পর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ!! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে এত বিভিন্নতা বুঝিয়াও দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি পাইলে বল দেখি?

বাহ্যজগতের অবাস্তবিকতা।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে বাহ্যজগতের প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থা আমরা জানিতে পারি না; পরন্তু বাহ্যজগতের দ্রব্য-ধাতুগত আপেক্ষিক অস্তিত্বই কি আমরা

নিঃসন্দেহে জানিতে পারি? বাহ্যজগতের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের বস্তুগত কোন প্রকার পরিচয় নাই। আমরা কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি কতকগুলি ভাব অনুভব করি এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সেই সকল ভাবকে মদিতর বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া মানিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপাদি কোন বাহ্যবস্তুর বিশেষ গুণ নহে; সে সকল আমাদের দেহেরই এক প্রকার অবস্থা মাত্র, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভবে না। সত্য বটে, রূপাদি অনুভব করিতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বাহ্যবস্তুর গুণ নহে, আমাদেরই দৈহিক এক অবস্থাবিশেষ। সেই জন্য কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দেখিতে পাই না, আবার কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দর্শন করিতে পারি। বাহ্যবস্তু আমাদের এমন কোন জ্ঞানই জন্মাইয়া দিতে পারে না, যাহা আভ্যন্তরীণ কারণে, বাহ্যবস্তুর অবর্ত্তমানে আমরা অনুভব করিতে পারি না। স্বপ্নে আমরা কত কি অবর্ত্তমান বস্তুর রূপাদি দর্শন করি, জাগ্রত সময়েও কত কি অদ্ভুত-ভৌতিকক্রিয়া দেখিতে পাই। সান্নিপাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা সুরাতঙ্কিত ব্যক্তি বাহ্যবস্তুর সংসর্গ-

নিরপেক্ষ আভ্যন্তরীণ কারণে কত কি বিভীষিকা দেখে, আবার যখন আমরা ঘুমাইয়া থাকি, তখন সম্মুখে বাহ্য জগৎ যদিও বাস্তবিকতার জ্বলন্ত দীপ্তিতে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না। জাগ্রত সময়েও যখন মন কোন চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তখন বাহ্য-বস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করিতে পারি না। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছিলেন, তখন তিনি দুর্ব্বাসার ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রের বিজলী-জ্যোতিও দেখিতে পান নাই, তাঁহার সেই শ্রবণবিদারক অভিসম্পাতের তীব্র বজ্রধ্বনিও শুনিতে পান নাই!

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা সকলের মধ্যে অনেকেই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া এপর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের চক্ষে ভেল্কি লাগিয়াছে এবং সেই ভেল্কি না ভাঙ্গিলে ভব-ভেল্কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা বৃথা। ইঁহারা বলেন যে, রূপাদির জ্ঞান হইতে বাহ্যবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব এত প্রয়োজনীয় নহে। রাশি রাশি রূপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকুক, তোমার যদি দর্শেন্দ্রিয় না থাকে, দর্শনশক্তি না থাকে, তবে সে রূপ দেখে কে? পক্ষান্তরে, যদি আমার দর্শনশক্তি থাকে, তবে বাহ্যরূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি রূপের

হাট বসাইতে পারি! অন্ধকার গৃহ, চক্ষুও মুদিত, ঘরের কোথাও কোন রূপ দেখা যাইতেছে না, একবার আমার চক্ষুগোলকের একটী পার্শ্ব যদি টিপিয়া ধরি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব, অদৃষ্টপূর্ব্ব কেমন উজ্জ্বল আলোকচক্র আমার চক্ষুর অনতিদূরে অপূর্ব্ব শোভা-সঞ্চার করিতেছে। পুনশ্চ, আমি হয়ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে অন্ধকার গৃহে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, ঘরে কৃত কত সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই দেখিতেছি না, তবু কিন্তু যে সকল বস্তু পূর্ব্বে সে ঘরে দেখি নাই এবং ঘুম ভাঙ্গিলেও যাহা দেখিতে পাইব না, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছি!! আমার এই অবস্থা—যাহাকে আমি স্বপ্ন বলি, তাহা যদি এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত যে, আমি জাগরিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপরিচিত পদার্থ সকল আমার সম্মুখ হইতে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়াছে, আমার মানসপট হইতে তাহাদের স্মৃতিরেখাপর্য্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আমি আমার সেই সুদীর্ঘ সুপরিচিত স্বপ্নরাজ্যের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী অপরিচিত জাগ্রত রাজ্যের কামনা করিতাম? যে ব্যক্তি উন্মত্ত অবস্থায় কল্পনা-বলে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগৎকে ভুলিয়া, তাহার স্থানে নূতন জগৎ গড়াইয়া, তাহাকেই আপনার

সাম্রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, সে কি সেই মত্ততার বিনিময়ে এমন অপ্রমত্তাবস্থা কামনা করে, যাহাতে সে তাহার সুখের রাজ্য হারাইয়া, বিকট বিভীষিকাময় দারিদ্র্যের জ্বলন্ত আলিঙ্গনে জীবন্তই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে যাইবে? ধ্যানমগ্ন যোগী যে এই সর্ব্বদুঃখালয় জগৎকে তাঁহার মনঃপ্রদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার স্থানে সর্ব্বসুখালয় শান্তিপ্রদ অধ্যাত্মজগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহারই শান্তিময়-ক্রোড়ে বসিয়া ভূমানন্দ-সুধা পান করিতেছেন, তিনি কি আবার সাধ করিয়া পার্থিব-গরল পানের জন্য ব্যস্ত হইবেন?

স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার করিয়াও আমরা সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর অলীকতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা শৈশব হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের—পঞ্চ অন্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া শিখিয়াছি যে, আমি স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা, আর জাগ্রতে যাহা দেখি, তাহা সত্য; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমি সহজ অবস্থায়—জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে সত্য, আর স্বপ্নোন্মত্ততাদি অবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে মিথ্যা? স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা যে মিথ্যা, একথা কি আমি স্বপ্নসময়ে মনে করিতে পারি? যে উন্মত্ত, সে তাহার উন্মত্ত অবস্থা অনুন্মত্তের মত জানিতে

পারে না; আমিও যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় বিষয়ই অলীক। জাগ্রতসময়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় যেমন মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট বাহ্যজগতের পরিচয় দিয়া থাকে, আমার স্বপ্নসময়েও তাহারা ঠিক তেমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট স্বপ্ন-কল্পিত জগতের পরিচয় দিয়া থাকে! যতক্ষণ আমি জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ আমি যেমন মনে করি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক, তেমনি যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণও আমি ভাবি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক। যাহার জাগরণের বিরাম নাই, তাহার নিকট তাহার জাগ্রৎজগৎ যেমন সত্য, যাহার স্বপ্ন ভাঙ্গে না, তাহার নিকট তাহার স্বপ্নজগৎও তেমনই সত্য। স্বপ্ন ভাবিলে, জাগরণে দৃষ্ট-পদার্থ বা ঘটনার তুলনায় স্বপ্নে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনাকে মিথ্যা বলিলে, জাগরণের অভাব কালের স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার তুলনায় জাগ্রৎকালের ঘটনাকেও মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন নহে—স্বপ্নও জাগরণ; জাগরণ কালের জাগরণ যেমন ঠিক, তেমনই জাগরণ। আর যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, জন্মের পুর্ব্ব ও মৃত্যুর পরের মহাসুষুপ্তির

অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাকে একটী ক্ষুদ্র স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইটীই আমারই অবস্থা এবং এই দুইটী অবস্থাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যার আলো-আঁধারিতে যতই বিসদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি, ফলে পারমার্থিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই এক প্রকৃতির। উভয় অবস্থাতেই মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকে না। জাগ্রতকালে মন যেমন তাহার পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও মন তেমনই তাহার সেই সময়ের পরিকল্পিত জগতের সুখ-দুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। প্রভেদ এইটুকু যে, স্বপ্নকালের সেই সকল কল্পনা জাগরণকালে এবং জাগ-রণকালের কল্পনা স্বপ্নকালে পুনরাবর্ত্তন করে না এবং সেই জন্য স্বপ্ন-জগতের কল্পিত বস্তু জাগরণকালের কল্পিত বস্তুর সহিত মিলে না; কিন্তু এক অবস্থার অনুভূতি অন্য অবস্থার অনুভূতির সহিত না মিলিলেও, তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটীকে বস্তুগত সত্য মনে করিয়া, নির্দ্দিষ্ট অন্যটীকে বস্তুগত মিথ্যা বলিবার কি কারণ আছে? কেন, স্বপ্নজগতকেই বস্তুগত সত্য ধরিয়া লইয়া, জাগরণ-জগতকেই কেন মিথ্যা বলি না? ঘুমের ঘোরে যখন সঞ্চরণ করিয়া থাকি, তখন ত প্রায়ই জাগরণকালের

অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইয়া সময়ে সময়ে এমন সকল জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকি যে, স্বপ্নের পর জাগরণকালে তাহার বিন্দুমাত্রও মনে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়াও, তাহার সত্যতা অস্বীকার করিবার সাহস পাই না। পুনশ্চ, যদি এইরূপ স্বপ্ন-সঞ্চরণকালে প্রত্যহ একই ধরণের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করি এবং তৎকালে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বপ্নকালের কার্য্য স্মরণে আনিতে পারি, আর জাগরণকালে যদি নিত্য নূতন নূতন কার্য্য করি এবং কোন এক সময়ের কার্য্য যদি অন্য সময়ে মনে করিতে না পারি, তাহাহইলে বরং স্বপ্নজগৎকেই সত্য জ্ঞান করিয়া আমার জাগরণ-জগৎকেই মিথ্যা বলিতে চাহিব। আবার দেখ, স্বপ্নজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব জাগ্রতে অস্বীকার করিতে পারি না। জাগরণের পূর্ব্বে যে স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, তাহা জাগরণকালে বেশ মনে পড়ে, কিন্তু জাগরণকালের কোন অনুভূতিরই জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না! জাগরণকালের সর্ব্বপ্রকার শোক, সন্তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, স্বপ্নের যাদুদণ্ড-স্পর্শে কোথায় চলিয়া যায়! তাহার স্মৃতিমাত্রও হয়ত স্বপ্ন সময়ে থাকে না; কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নের শোক, সন্তাপ বা আনন্দ-উল্লাস সকলই আমি ভুলিয়া যাই না; সুতরাং জাগরণের সাক্ষ্য-প্রমাণে

স্বপ্নাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণে জাগরণাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হই-তেছে না। আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, তাহার মধ্যে সুষুপ্তি ও স্বপ্ন-অবস্থাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, সকল অবস্থারই অভিনয় করিতে পারি! স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ত স্বপ্নই আমার জাগ্রদ-বস্থা; তাহার পর স্বপ্নে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়েও স্বপ্ন দেখা যায়! সুতরাং লক্ষ্মণের ন্যায় যে চৌদ্দ বৎসর একাদিক্রমে জাগরিত থাকে এবং তাহাই যাহার চূড়ান্ত আয়ুষ্কাল, তাহার সুষুপ্তি ও স্বপ্নের জ্ঞান আদৌ হইবার নহে; পরন্তু কুম্ভকর্ণের মত যে ছয় মাস একাদিক্রমে স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্নের মধ্যেও জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, কোনটাই আমার নিষ্ক্রিয়াবস্থা নহে। সুনিদ্রাকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি বলিয়া যে মনে করি, তাহা ভ্রম মাত্র। উপনিষৎ শাস্ত্র জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনাবস্থার অতীত চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাকেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থা বলিয়াছেন। উহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের অবস্থা; সাধক সুষুপ্তি বা সমাধি-সাধনেই

সে তত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন। সাধারণ মানব সুষুপ্তি বা স্বপ্ন-তত্ত্বও বুঝে না। ঘুমের ঘোরে যে আমি নিশ্চিন্ত থাকি না, স্বপ্নসঞ্চরণই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। তদ্ভিন্ন স্বপ্নসঞ্চরণ অবস্থার বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তৎকালে সচেষ্ট থাকে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যদিও সজাগ থাকেন, তথাপি চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট থাকে। বাস্তবিক স্বপ্নসঞ্চরণকারী একরূপ—

"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

সে নিমীলিতনেত্রেও উন্মীলিতনেত্রের ন্যায় দেখিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহার বাহ্যকর্ণের নিকট বন্দুকের আওয়াজ্ করিলেও সে তাহা না শুনিতে পারে, অত্যুগ্র গন্ধও তাহার বাহ্য নাসিকাকে উদ্বিগ্ন না করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে ননাপ্রকার ব্যথা দিলেও সে তাহা সহজে অনুভবে না আনিতে পারে, অথচ অভৌতিক সত্ত্বা সমূহ তাহার তাৎকালিক অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়নিচয়ে ভৌতিকবৎ প্রতীয়মান হয়! আধুনিক "মেস্‌মেরিজম্" "ক্লার্‌ভয়েন্স" প্রভৃতি তত্ত্বেও এই সত্য প্রমাণিত।

স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি যেমন নিষ্ক্রিয় থাকি না,

সাধারণ স্বপ্নকালেও আমি তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকি না। জীবের সক্রিয়ত্ব দৈহিক সম্বন্ধেরই একান্ত অধীন নহে। তখন নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হইলে, স্বপ্নকার্য্যটীই মিথ্যা হইত; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকুক্ আর নাই থাকুক্, স্বপ্নব্যাপারটী অস্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না জাগ্রতকালে যেমন ইন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি সজ্ঞানে কার্য্য করি, স্বপ্নকালেও তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি তেমনি সজ্ঞানে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। স্বপ্ন-জগৎকে আমি সাধারণতঃ হেয় মনে করি সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে, স্বপ্ন-জগৎ একেবারেই অলীক; পরন্তু স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী এবং জাগরণ-অবস্থার ন্যায় ইহার কোন এক অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি প্রায় হয় না; এই কারণে স্বপ্ন-জগতের কোন একটী কল্পনায় আমি অভ্যস্ত বা সংস্কারবদ্ধ হইতে না পারিয়া তাহাকে অলীক মনে করি; কিন্তু যদি কখনও নিদ্রাকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ একই ধরণের স্বপ্ন দেখি এবং জাগরণকালে যদি কখনও একই ধরণের কার্য্য না দেখি, তাহাহইলে আমি জাগরণ-দৃষ্ট জগৎকেই অলীক এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। প্রকৃতপক্ষে মন

কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কোনকালেই নিষ্ক্রিয় হয় না। মৃত্যু-তত্ত্ব বুঝাইতে গীতা বলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
—ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

ফলে মরণের পর যেমন স্থূলদেহ ছাড়া আর সবই থাকে, স্বপ্নকালেও প্রায় তদ্বৎ।

স্বপ্নকালে জাগরণকালের জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গত্যাগ করে ও নূতনবিধ জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গ লইয়া থাকে।

স্বপ্ন বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি না, ইহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু সুষুপ্তিকালে আমি কি অবস্থায় থাকি? তখন কি আমি বাহ্য-নিষ্ক্রিয় হইয়াও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকি? প্রচলিত মত বা সংস্কার তাহাই বটে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, সুষুপ্তিকালে আমরা সর্ব্বপ্রকার মানসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি এবং তৎকালের সজ্ঞান অবস্থার কোনরূপ স্মৃতিই কি সুষুপ্তিকালে, কি জাগরণ-কালে, কোন কালেই থাকে না; কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় সজ্ঞানে থাকার কোন স্মৃতি-প্রমাণ পাই না বলিয়া কি সত্যসত্যই আমি সে সময়ে অজ্ঞানে ছিলাম, বিবেচনা করা উচিত?

একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিদ্রাকালে আমি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি ভিন্ন একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান থাকি না। জাগরণকালে আমি যেমন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তিতায় কার্য্য করি, কিম্বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে যেমন পূর্ব্বকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া নবকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় কার্য্য করি, অথবা স্বপ্নকালে যেমন স্বপ্নকল্পিত নূতন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় কার্য্য করি, সুষুপ্তিকালে তেমন না করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাহ্যজ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা ত্যাগ করিয়া কেবল মানসিক সক্রিয়-সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকি। অতএব,

"তদা স্বরূপেঽবস্থানম্"

নিদ্রা সময়ে আমি চিন্ময়স্বরূপেই অবস্থান করি। সেই জন্য কদাচিৎ কল্পিত জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়াও,—

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তিকামস্পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।

তদেব শুক্রস্তদ্ ব্রহ্ম"

এই ব্রহ্মরূপে আমার তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার অন্যবিধ পরিচয়ে সেই অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলিয়াই বুঝা উচিত।

নিদ্রাবস্থায় যে আমি অজ্ঞানে থাকি না, একটু ভাবনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিদ্রার পূর্ব্বে যদি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা যাই, তাহাহইলে প্রায়ই সেই সময়ে জাগরিত হইতে সক্ষম হই। আবার যখন কোন কোলাহলময়ী নগরীতে যাই, তখন চতুর্দ্দিকের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া, প্রথম প্রথম হয়ত ঘুমাইতে পারি না, পরে কোলাহলের মধ্যেই ঘুমাইতে পারি। উভয় অবস্থাতেই কোলাহল তুল্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও এবং উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গ্রাম তুল্যরূপে ঘাতপ্রাপ্ত হইলেও, কেবল মনের তিতিক্ষা-শক্তির সচেতন অবস্থার জন্য নিদ্রাকালে সেই বিরক্তি অনুভব করি না। পুনশ্চ, যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার লইয়া তৎপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়ি, তখন রোগীর অসম্পর্কিত কোন উচ্চ শব্দেও উত্যক্ত না হইয়া, রোগীর শুভাশুভ-জ্ঞাপক প্রত্যেক সামান্য পরিবর্ত্তনেও জাগিয়া উঠি! জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর পতিত প্রবলতর ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা ক্ষীণতর ক্রিয়ার প্রতি মন এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে পারে কেন? এ সকলই কি মনের সার্ব্বকালিক সক্রিয়াবস্থার— আত্মার সর্ব্বদা সজ্ঞানে থাকিবার পরিচায়ক নহে? স্বীকার করি যে, নিদ্রাকালে যে আমি সজ্ঞানে থাকি, তাহা সহজে

বুঝিতে পারি না, কিন্তু জাগরণকালের সজ্ঞানঅবস্থাই কি আমি সহজে বুঝিতে পারি? জাগরণকালের অনেক জ্ঞানকেই বিস্মৃতির বিবরে লুক্কায়িত দেখি। আবার স্মৃতি-বিস্মৃতি উভয়ই পরস্পরের অনুগত। সেই জন্য প্রত্যেক স্মৃতির কার্য্যে বিস্মৃতি এবং প্রত্যেক বিস্মৃতির কার্য্যে স্মৃতিকে জড়িত দেখি। আমরা যখনই কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করিতে যাই, তখনই বর্ত্তমানের ঘটনাকে অন্তরালে ফেলি, অথচ বর্ত্তমানকাল আদ্যন্তহীন কালচক্রের সর্ব্বত্রই কেন্দ্ররূপে দেদীপ্যমান। যাহাকে আমি ভূত বা অতীত বলি, তাহা এই বর্ত্তমানেরই শিশুভাব এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা বর্ত্তমানেরই অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধভাব। যুবা যেমন তাহার যৌবন বজায় রাখিয়া বাল্যাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিতে পারে না, তেমনি বর্ত্তমানের জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তার সজ্ঞানাবস্থা ভোগ করিতে পারি না। আমি যখনই অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করি, তখনই বর্ত্তমানের ঐন্দ্রিয়িক বিশেষ অনুভূতি বা চিন্তা অদৃশ্য হয় এবং সময়ান্তরে এই সকল অবিশেষ এবং নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-কার্য্যগুলি স্মরণ করিতে যাইয়া যখন আমি তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাধ্য কোন কার্য্য দেখিতে পাই না, তখন নিরৈন্দ্রিয়িক ভূমাজ্ঞানকে বিশেষ-

রূপে অবধারণ করিতে না পারিয়া, অসতর্কিতভাবে তদ-বস্থাকে আপনার নিষ্ক্রিয়াবস্থা বলিয়া মনে করি ; কিন্তু পরমার্থতঃ আমি—অর্থাৎ আত্মা কখনও সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়—জ্ঞানশূন্য হইতে পারে না। জীবাত্মা নিত্য-সগুণত্বে সদা সক্রিয় ও নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপত্বে সদা সজ্ঞান।

নিদ্রার সময়ে আমি সজ্ঞানে থাকিয়াও যেমন সে সময়-কার সজ্ঞান অবস্থার বিশেষাবধারণা করিতে পারি না, তেমনই আমার অতীত শিশুজীবনের যে প্রথম দিনে জননী জঠরের ঘোর অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময়ী পৃথিবীর আলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই দিনের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে যাইয়া আমি তাৎকালিক সজ্ঞানাবস্থার কোন বিশেষ অবধারণা করিতে পারি না ; অথচ সে সময়ে যে একেবারে অজ্ঞানে ছিলাম, একথা বলিতে সাহস পাই না, কিন্তু কি প্রকার জ্ঞানের অবস্থায় ছিলাম, তাহারও ঠিক প্রতীতি করিতে পারি না। ফলতঃ আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রারম্ভাভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই যেন কুহেলিকার মধ্যে পড়ি এবং সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার একটী ক্ষীণ আলোকরেখাও আমার স্মৃতিপটে সুপ্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু কুহেলিকাবৃত বালারুণ-

জ্যোতিবৎ শৈশব-জ্ঞানের শান্তমূর্ত্তির আভাস পাইয়া থাকি। ভ্রূণাবস্থায়ও যে আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান ছিলাম, এমনটা ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমার জ্ঞান-প্রবাহ যেন একটী অবিচ্ছিন্ন ধারায় অতীতের অনধিগম্য কন্দর হইতে নিঃসৃত হইয়া, ভবিষ্যতের দুর্গম প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে এবং কেবল দূরত্বজন্যই মধ্যস্থ বর্ত্তমানের ন্যায় সেই দুইটী প্রান্ত দেখা যাইতেছে না। এজগতে—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত॥
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

(গীতা)

যত কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের সাংসারিক জ্ঞান, কল্পনা বা সত্ত্বা, সকলেরই আদি এবং অন্ত অব্যক্তাবস্থাপন্ন; কেবল মধ্যমাংশই ব্যক্ত দেখা যায়। জীব-জ্ঞানপ্রবাহ এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। আদ্যন্তহীন জ্ঞান-প্রবাহের গতিদিক্ পরিবর্ত্তন জন্য তাহার উভয় প্রান্ত সরল দৃষ্টিপথের বাহিরে এবং দূরে পড়ে বলিয়া তত্তৎপ্রদেশের কোন বিশেষ অবধারণা হয় না; কিন্তু চেষ্টা করিলে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া যোগাভ্যাস-বলে যত্ন করিলে, জ্ঞান-প্রবাহের—কল্পনা-প্রবাহের সরলাংশের উভয়

প্রান্তস্থ লীলাবর্ত্তকে মধ্যস্থানে সংযুক্ত ও নিশ্চল করিতে পারা যায় এবং যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা "জাতিস্মর" হন এবং সুষুপ্তি-মধ্যে চৈতন্যানুভব করা ত সামান্য কথা, একজন্মের অন্তকালীন মানসিক অবসন্নতার মধ্যেও পরজন্মের আরম্ভের সম্প্রকাশ দেখিতে পান এবং উভয় জন্মকেই একই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমনশীল অংশরূপে বুঝিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ নিদ্রা আমার নিশ্চিন্ততার সময় নহে, পরন্তু চিন্ময় আত্মার নিরপেক্ষ চিন্তারই সময় বটে; প্রভেদ এইটুকু যে, তৎকালে পূর্ব্বাভ্যস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমি অন্যবিধ চিন্তা করি এবং উভয় চিন্তার সংযোগ-সূত্রটী পৃথক্ পৃথক্ স্রোতে ভাসিতে থাকায়, আধ্যাত্মিক অনবধানতা বশতঃ আমি একের সহিত অপরের বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একটীকে মিথ্যা, অন্যটীকে সত্য বলি! পরমার্থতঃ জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ, সকলই সেই একমাত্র চিন্ময় আত্মার ধারাবাহিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আমরা এক অবস্থার সহিত অন্যাবস্থার জ্ঞান-ধারার গতি-বৈষম্য বিচার করিয়া, বোধসৌকর্য্যার্থে এক এক অবস্থার এক এক নাম দিয়া থাকি। মূলে জন্ম ও মৃত্যু, একই ভূমা চৈতন্য-প্রবাহের অন্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক ও নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান নামে

নির্দ্দেশ্য দুইটী ধারা এবং সুষুপ্তি ও জাগরণ, আয়ুষ্কালাবচ্ছিন্ন-জন্মোপলক্ষিত জ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দুইটী আবর্ত্তন, আর স্মৃতি ও বিস্মৃতি পুনঃ জাগরাণাখ্য খণ্ড-প্রবাহের খণ্ড ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বিস্মৃতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থাকেও আমি সময়ে অব্যক্ত বলিয়া ভ্রম করি। এরূপ ভ্রম হইবার কারণ আছে; মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া কার্য্য করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন কার্য্যগুলির বিসদৃশ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক কার্য্যগুলি যেমন সবিশেষে বুঝা যায়, মন যখন ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করে,—নিরিন্দ্রিয় হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভূমা-বিষয় চিন্তা করে, তখন বিচ্ছিন্নভাব-বিশ্লেষণাভাবে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যাদির নিরোধ দর্শনে মানসিক কার্য্যেরও নিরোধ হয় বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ঠিক্ সেই মত, যেমন—

> "ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধ্যাদিষ্বিহনিদ্রয়া
> লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ। ১৩।
> মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা
> নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥" ১৪

ভাগবত III 27.

বিত্ত নাশ হইলে লোকে আপনাকে বিনষ্ট মনে করে, তেমনি বিশ্ব-বিকল্পনার বিরামরূপিণী নিদ্রার বশে যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ অসতে লীন হয়, তখন সদাজাগরিত আত্মা আপনাকে সেই বিশ্বের বিরচন-বুদ্ধি-বিরহিত দেখিয়া মিছামিছি আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করেন! ফলতঃ পার্শ্বে নৈমিত্তিক খণ্ড রূপাদি বর্ত্তমান না থাকিলে, নিত্য ভোগ্য ভূমারূপাদির বিশেষত্ব যেমন অনুভবে আসে না, তেমনি নিদ্রেতর অবস্থায় নৈমিত্তিক সংসারাসক্তিজ সুখ দুঃখের ঐন্দ্রিয়িকী কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মা যখন আপনার নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সেই এক ভূমানন্দ ভোগে থাকেন; তাহার বিশেষক অন্য কোন খণ্ডানুভূতি তৎকালে উপস্থিত না থাকায়, আত্মা তাহাকে জাগরণাবস্থার শতধাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সাদৃশ্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আত্মা নিদ্রাকালে অন্যবিধ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের কল্পনার কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু উভয়কালীন কল্পনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, একাবস্থার কার্য্য অন্যাবস্থার চেষ্টায় প্রকাশ করিতে যে অক্ষমতা থাকে, তাহাই সুষুপ্তির রূপ ধারণ করে এবং সেই জন্য সুষুপ্তিকালের সজ্ঞান অবস্থা

বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, ঘুমের ঘোরে যে আমি নিষ্ক্রিয় ও অবুদ্ধ থাকি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার সাক্ষীও ত আমিই। আমি নিদ্রাকালেই বুঝিতেছিলাম যে, তৎকালে জাগ্রদনুভূত কিছু অনুভব করিতেছিলাম না। আমি যদি স্বরূপতঃ নিদ্রাকালে সজ্ঞানে নাই থাকিব, তবে তদবস্থায় অজ্ঞানতা কি করিয়া বুঝিব? স্বরূপতঃ আমি কখনই আমার সদা-জাগরিত অবস্থা অস্বীকার করিতে পারি না; তবে যে কখনও আপনাকে নিদ্রিত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা জাগরণেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রাকালে আমি জাগ্রদধিগম্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অনাসক্ত থাকি ভিন্ন স্বরূপতঃ আমি নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অজ্ঞান থাকি না। সেরূপ অজ্ঞানে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বরূপতঃ নিদ্রা আত্মারই এমন একটী অবস্থা, যাহার আদ্যন্ত-মধ্য, সর্ব্বত্রই আত্মাই তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ও সাক্ষী। সুষুপ্তি আত্মার স্বরূপ অবস্থা। সে সময়ে—

'দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'

আত্মা সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করেন; ইন্দ্রিয়াধিগম্য সংসারের কোন অনুভূতির সাদৃশ্যেই তাহার অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না।

জাগরণকালে ও স্বপ্নসময়ে আত্মা আত্মশক্তি হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত কার্য্যের সুখ-দুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হন। জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইই আত্মার বিরূপ অবস্থা এবং এই দুই অবস্থা ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ জ্ঞান করা হউক, ইহারা মূলে একই প্রকৃতির। কখনও কখনও মনে করি বটে যে, জাগরণ-অবস্থাটী আসল এবং স্বপ্ন তাহারই নকল; জাগরণকালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই চিত্র যাহা মানসপটে ক্ষয়িতবর্ণে অলক্ষিত থাকে, নিদ্রাকালে তাহাই উজ্জ্বল বর্ণে পুনঃ প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। জাগ্রতে যেমনটী দেখি, স্বপ্নে তেমনটী নাও দেখিতে পারি এবং জগতে যেমনটী দেখি নাই, স্বপ্নে তেমনটীও দেখিতে পারি! ইহা কিছু স্বপ্নরাজ্যের বিরল ঘটনা নহে যে, একদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এমন একটী জীব দেখিলাম, যাহার মস্তক হস্তীর মস্তকের মত এবং দেহ সিংহের দেহের মত। এখন এই যে নূতন প্রাণী দেখিলাম, ইহা পূর্ব্বে কখনও আমার দেখা না থাকিলেও আজ স্বপ্নে তাহা দেখিলাম—নূতন দেখিলাম। সুতরাং স্বপ্নে যে নূতন কিছু দেখি না, যাহা কিছু দেখি, তাহা জাগ্রতে দৃষ্টেরই নকল, একথা কি করিয়া বলি? সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, গজ-সিংহ-

মূর্ত্তিটী হয়তো আমার নূতন দেখা হইল না—পূর্ব্বে যাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা ছিল, তাহাই আজ একত্রে দেখা গেল মাত্র; কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। অমূলক এই জন্য বলি যে, পূর্ব্বে হস্তী ও সিংহ পৃথক্ পৃথক্ দেখা থাকিলেও তাহাদের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী তো আর দেখা ছিল না; এখনই কেবল দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে যে সংযোগটী আমার দেখা ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও ছিল না, আজ স্বপ্নের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐন্দ্রজালিকী-শক্তির বলে সেই অভাবনীয় সংযোগটী দর্শন করিলাম। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী কি নূতন হইল না? বস্তুতঃ আমার অসম্ভাবিত যাবতীয় অনুভবই—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক সম্বন্ধাবদ্ধ এবং সেইজন্য সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক। যখনই আমার কোন পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহাকে আমার পূর্ব্বানুভূত কোন পদার্থের সদৃশ বা অসদৃশ বলিয়া বুঝি; তদ্ভিন্ন অন্যরূপে বুঝিতে পারি না। সেইজন্য কোন পদার্থকে স্বপ্নেই দেখি বা জাগ্রতেই দেখি, সকলসময়েই তাহাকে আমি দৃষ্টপূর্ব্ব কোন না কোন পদার্থের সহিত কোন অংশে সমান এবং কোন অংশে অসমান না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া কথাটা পরিষ্কার করি। আমি জাগ্রদবস্থায় একখান নৌকা দেখিলাম, আর

কোন দিন নৌকা দেখি নাই, যেন আজই নূতন দেখিলাম; কিন্তু যে অর্থে স্বপ্নে নূতন কিছুই দেখা যায় না বলি, সেই অর্থে এই জাগ্রতে দৃষ্ট নৌকাই যে নূতন দেখিলাম, তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? নৌকা দেখিতে আমি একটী সীমাবদ্ধ বস্তু দেখিলাম, কিন্তু সীমাবদ্ধ রূপ নৌকা দেখার পূর্ব্বেও আমি দেখিয়াছি; নৌকা দেখিতে আমি যে বর্ণ দেখিলাম, তাহাও নৌকা দেখার পূর্ব্বে আমি অনেক বার দেখিয়াছি; তাহার পর সীমাবদ্ধ নৌকার রূপ দেখিতে সীমা নির্দ্দেশক যে সকল সরল ও বক্র রেখা দেখিলাম, তাহাও আমি কতবার কত স্থানে দেখিয়াছি; নৌকার রূপ-নির্দ্দেশক রেখার বিন্যাসের মত বিন্যাসও আমি পূর্ব্বে একত্রে বা পৃথক্‌রূপে ভূয়োভূয়ঃ দর্শন করিয়াছি। নৌকার উপাদানভূত কাষ্ঠ ও লৌহের মত কাষ্ঠ ও লৌহও আমি পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি; সুতরাং যে নৌকাকে আমি আজ নূতন দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিভাবে নূতন দেখা হইলেও তাহার উপাদানগত ব্যষ্টিভাবে নূতন দেখা হইল না। পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি কাষ্ঠ ও লৌহকে পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি আকারে বা ক্রমে বিন্যাস করিয়া আমি নৌকা গড়াইয়া দেখিতেছি। পূর্ব্বদৃষ্ট কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থকে

স্বপ্নে একত্র করিয়া যেমন একটী অভূতপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টি করি বলিয়া মনে করি, ঠিক্ তেমনি আমার জাগরণকালেও কতকগুলি পূর্ব্বপরিচিত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে একত্র করিয়া নূতন একটী পদার্থ গড়াইয়া থাকি বলিয়া মনে করা উচিত। ফলতঃ যদি স্বপ্নকালে অননুভূতপূর্ব্ব নূতন রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমান ন্যায়ে জাগ্রতকালেও আমার অননুভূতপূর্ব্ব রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই হউক আর জাগরণেই হউক, আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে অননুভূতপূর্ব্ব কোন রূপাদি অনুভব করিতে পারি না। প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে যখনই বিশ্লেষণ করিতে যাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহা কতকগুলি অনুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের সংঘাত ফল মাত্র। কিন্তু যদিও এইরূপ প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংঘাত বলিয়া স্মরণ হয়, তথাপি সেই সকল পূর্ব্বানুভূতির পূর্ব্বানুভূতিকে—অতিপূর্ব্ব-পূর্ব্বানুভূতিকে স্মরণে আনিতে পারি না। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই আদি অব্যক্ত এবং সেই সকল বিষয়ের অনুভূতির আদিও অব্যক্ত। ইহজন্মে যে মুহূর্ত্তে জননীর গর্ভগত ক্ষীর-সাগর-শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি ধরণীর কঠিন পৃষ্ঠে অবতীর্ণ

হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞানের কি পরিমাণ সম্বল লইয়া আমি আসিয়াছিলাম এবং তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই মূলধনের কিরূপ উপচয়-অপচয়ে বর্ত্তমান জ্ঞানের অধিস্বামী হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। নির্দ্দিষ্ট কোন্ সময়ে এই সংসারের সহিত কিরূপে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অবধারিত কথা যে, এই সংসারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় যে কালে যতই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকুক্, সেই পরিচয়লব্ধ আদি জ্ঞানগুলিকেই ঘসিয়া মাজিয়া লইতে লইতেই আমার জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমানের বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সকল অনুভূতির মধ্যেই যেমন তাহাদের প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারি, তেমনই সকল অনুভূতিই যে পূর্ব্বানুভূতির অবিকৃত প্রতিরূপ, তাহাও বলিতে পারি না। প্রত্যেক অনুভূতি যেমন কিয়দংশে পূর্ব্বানুভূতির প্রতিরূপ, তেমনই কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বানুভূতি হইতে বিরূপ এবং এই বিভিন্নতা যতই অধিক হয় এবং পূর্ব্বানুভূতি গুলিকে যতই বিস্মৃত হই, ততই বর্ত্তমান অনুভূতিকে নূতন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। প্রত্যেক অনুভূতিই পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইলে, স্মৃতি-বিস্মৃতির ন্যূনাধিক্যে কালে তাহা কখনও পরিস্ফুট, কখনও

অস্ফুট হইয়া পড়ে এবং একই অনুভূতির মধ্যে বিভিন্নতা বোধ জন্মে। নীল ও লোহিত বর্ণ এত যে বিভিন্ন, তথাপি উভয়ের রূপত্বের একতা আছে। তিক্তাস্বাদ এবং মিষ্টাস্বাদ, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও রসত্বমাত্র বিষয়ে উভয়ের একতা বুঝিতে পারি। আবার রূপের ও রসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ের একতা বুঝিয়াই উভয়কেই অনুভূতি বলিয়া বুঝি। ফলতঃ আমাদের সাংসারিক জ্ঞানোদয়ের—সংসার-সৃষ্টি-কল্পনার আদি ও অন্ত যে দুই প্রান্ত অব্যক্তের গাঢ় অন্ধকারে বিলীন, তাহা বাদ দিয়া মধ্যাংশের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কোন অনুভূতিই একেবারে অননুভূত-পূর্ব্ব নহে, অনুভূতপূর্ব্বও নহে, তা সে অনুভূতি স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক। ফলতঃ তদানীন্তন অনু-ভূতির প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা স্বপ্নের সহিত জাগরণের প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা বুঝা যায় না।

পরমার্থতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ, উভয়ই এক। চিন্ময় আত্মার সৃষ্টি-শক্তির দুইটী লীলাবর্ত্তনের মধ্যে মায়িক প্রভেদ সামান্য একটু যাহা আছে, তাহা এই যে, জাগ্রৎ-কালে পূর্ব্বানুভূতি সকলকে একত্র সংযত করিতে রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধযুক্ত একটী বস্তু চিন্তা করিতে পারি;

কিন্তু যেমন একটী বাহ্যবস্তু গড়াইয়া, তাহার জীবন্ত রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, স্বপ্নে তাহা পারি। জাগ্রতে অবিদ্যমান গজ-সিংহমূর্ত্তি চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, জাগরণের জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই স্বপ্নকালে অবিদ্যমান গজ-সিংহ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই প্রত্যক্ষীভূত গজসিংহকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিতে পারি না। ফলতঃ জাগরণের অনুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা যেমন জাগরণকালে বিশ্বাস করি, তেমনই স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা বিশ্বাস করি। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, উভয় অবস্থাতেই আমরা রূপ-রসাদি অনুভব করি; উভয় কালেই অনুভূতির অনুভাবনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি না; সন্দেহ করি কেবল অনুভূতির বাহ্য বস্তুনিষ্ঠতায়; অর্থাৎ জাগ্রতকালে রূপরসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে যেমন কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠগুণ বলিয়া বিশ্বাস করি, স্বপ্নে রূপ-রসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে তেমন কোন বাহ্য-বস্তুনিষ্ঠ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এখন বিচার্য্যবিষয় এই যে, জাগ্রতানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতা কেন স্বীকার করিব, আর স্বপ্নানুভূত রূপ-

রসাদির বাস্তবিকতাই বা কেন অস্বীকার করিব। মনে রাখা উচিত, জাগ্রৎকালে যেমন জাগ্রদনুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা স্বীকার করি, স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা তেমনই স্বীকার করি; জাগ্রতকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট-রূপাদির বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, স্বপ্নকালেও তেমনই জাগ্রত-দৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা মনে করি না। জাগ্রতের নিকট জাগ্রৎজগৎ যেমন বাস্তবিক সত্য, স্বপ্ন-অবস্থায় অবস্থিতের নিকট স্বপ্নজগৎও তেমনই বাস্তবিক সত্য। জাগ্রতের নিকট স্বপ্নজগৎ মিথ্যা, সুপ্তের নিকটও জাগ্রৎ-জগৎ অননুভূত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, উভয় জগতের বাস্তবিকতা বা অবাস্তবিকতার মীমাংসা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারি যে, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য দুইটার মধ্যে দুইটাই কখনও সত্য হইতে পারে না; হয় দুইয়ের একটা মিথ্যা, না হয় দুইটাই মিথ্যা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অনুভূত বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, উভয়ের সাক্ষ্যই মিথ্যা। আমরা সচরাচর জাগ্রতের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি; সুতরাং জাগ্রতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক যে, তাহার সাক্ষ্যকে কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা

স্বপ্নজগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, কিন্তু অবাস্তবিক স্বপ্নজগৎকে অস্বীকার করি না; অতএব জাগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণেই বুঝা যাইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে আমরা অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ কেন হয়? সম্মুখে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির আধার কোন বাহ্য-বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নদ্রষ্টা কি করিয়া রূপ-রসাদি অনুভব করিল? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার এমন একটী শক্তি আছে, যাহার বলে অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারে; সম্মুখে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শশব্দাদির বিষয়ীভূত কোন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে আমি আত্মশক্তি-প্রভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি অনুভব করিতে এবং সম্মুখে তদাধারের বিদ্যমানতা বিশ্বাস করিতে পারি; এক কথায় —অসত্যকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা যদি হইল, স্বপ্নসময়ে আত্মা অসত্যকে সত্যবৎ কল্পনা করিতে পারে, ইহা যদি বুঝিতে পারিলাম, তাহাহইলে স্বপ্নেতর সময়ে আত্মা যে কেন অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারিবে না, ইহা বুঝা যায় না। স্বপ্নজগৎ যদি অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জাগ্রত-জগৎও অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে বাধা কি? কোন বাধাই ত দেখা যায় না। স্বপ্নজগৎ যেমন প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইয়াও

স্বপ্নকালে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই জাগ্রত-জগৎও প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইলেও জাগ্রতকালে বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে পরমার্থতঃ উভয় জগৎই অবাস্তবিক; কিন্তু লৌকিকতঃ অবিদ্যার দৃষ্টিতে কোন জগৎই একেবারে মিথ্যা নহে। কেননা উভয় কালের বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব থাকিতেছে! এই কাল্পনিক জগতের কার্য্যও কাল্পনিক নিয়মদ্বারা অনুশাসিত হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা একটী বস্তু, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা একটী কল্পনা-স্তবক। যে কল্পনাগুলি সংযত করিয়া একটী কল্পনা-স্তবক হইয়াছে, সেই কল্পনাগুলির একটীর সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আপনিই আসিয়া যুটে। চিনি একটী কল্পনা-স্তবক, জিহ্বা একটী কল্পনা-স্তবক; চিনি জিহ্বায় সংযুক্ত হইল; এই কল্পনার সঙ্গেসঙ্গেই মিষ্ট-রসানুভূতি উৎপন্ন হইল; কেন না —

যস্ত কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
তদেব স স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

আদিতে যে কল্পনার পর যে কল্পনার সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে, পর পর কালে, সেই সেই কল্পনার একটীর প্রসঙ্গে পরভাবী কল্পনাটী আপনিই আসিয়া পড়ে। তাহাতেই

বলা হইতেছে যে, বাহ্যজগৎ যেমন আমার কল্পনা-প্রসূত, বাহ্যজগতের নিয়ম সমুদয়ও তেমনি আমার কল্পনা।

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অন্যের সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের যদি বাস্তবিকতা নাই থাকে, বাহ্যজগৎ যদি আমারই কল্পিত হয়, তাহাহইলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমি যে কল্পনা করি, আমি ভিন্ন আর দশজনও কেন ঠিক তেমনই কল্পনা করে? আমি যে সময়ে যে অবস্থায় যে বস্তু দেখিয়াছি—কল্পনা করি, আর সকলেও সেই সময়ে সেই অবস্থায় সেই দ্রব্য দেখে কি করিয়া? এতগুলি লোক যেসকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করিতেছে না, আমি সেই সকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমি ও আর দশজনে একই পদার্থকে দেখিয়া, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইবে, এমন নহে। কত সময়ে আমরা দশজনে একত্রে ভেল্কি দেখিয়া থাকি এবং সেই ভেল্কিদৃষ্ট বস্তু বা ঘটনা সকলই সত্যসত্য বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু তাই বলিয়া ভেল্কির অলীকত্ব ঘুচে না। পুনশ্চ,

আমি ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তাই সন্দেহের বিষয়, তখন একটী বস্তুকে আমি আর দশজনের সঙ্গে সমানভাবে দিখিতেছি, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আমি ভিন্ন অন্য বস্তুই যখন আমার অজ্ঞেয়, তখন আমার সম্বন্ধে আমার কল্পনার বাহিরে, আর দশজন কোথা হইতে আসিবে? দেখিবেই বা কি, আর তাহাদের সাক্ষ্যের একতাই বা কোথায়? সাক্ষ্যের একতা সম্ভবপরও নহে। যাহাকে আমি সাক্ষ্যের একতা বলি, তাহা বাস্তবিক নহে, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। কেন কাল্পনিক বলি, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সাক্ষী যদি মদিতর বাহ্য বস্তু হয়, তবে তাহার সত্তা আমার অজ্ঞেয়; কেননা যাহা আমা হইতে পৃথক্, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাকে আমি জানিব কি করিয়া? ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে চাও? কিন্তু মনে রাখিও যে, ইন্দ্রিয় বিশ্বাসভাজন নহে। একেত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বাহ্য কিছু জানিবার কথা নহে; জানিতে পারিবার 'কথা' থাকিলেও অবিশ্বাস্য ব্যক্তির কথা কি করিয়া সত্য বলিয়া মনে করিবে? আর যদিবা মৎসদৃশ—অথচ মদিতর আর দশজন ব্যক্তি থাকে এবং তাহারা বাহ্যজগৎ-সত্তার সাক্ষ্য দেয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও তাহাদের অনুভূতি আমার অনুভব করিবার কি সম্ভাবনা আঁছে? তাহারা যেরূপ

অনুভব করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে না এবং পারিলেও তাহাদের অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির নিরপেক্ষ একতা কি করিয়া বুঝিব ? তাহারা আমাকে যাহা জানাইতে চাহিবে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়া চাই ; সুতরাং তাহার অনুভূতিসমূহকে রূপ-রসাদিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাকে অনুভব করাইতে হইবে এবং রূপাদি কোন্ অবস্থার সহিত কোন্ অনুভূতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছে, তাহা আমার এবং তাহাদের, উভয় পক্ষেরই জানা থাকা আবশ্যক ; কিন্তু ইহাতে একটী অনুভূতির সহিত অন্য একটী অনুভূতির ভ্রম না হইবার কথা নহে। এইরূপে মিথ্যাকে সত্যের আদর্শে গ্রহণ করিয়া কি প্রকৃত সত্য বুঝিবার সম্ভাবনা আছে ? একটী আম্রের সম্বন্ধে তাহার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির ঐক্যানৈক্যের সম্ভাবনীয়তা আলোচনা কর। আমি আম্রের রূপ দেখিতেছি কিন্তু আমি সেই রূপ তাহাকে দেখাইতে পারিতেছি না। আম্রের যে সকল রূপ-তরঙ্গ আমার চক্ষের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, যে সকল রসাণু আমার রসনায় লয় পাইয়াছে, যে সকল গন্ধাণু আমার নাসারন্ধ্রে বিলীন হইয়াছে, যে সকল স্পর্শ আমার ত্বগিন্দ্রিয়ে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ-তরঙ্গ আমার

কর্ণকুহরে সুলুক্কায়িত হইয়াছে, সেই সকল রূপ-রসাদি আমি তোমার অক্ষিরসনাদির সম্বন্ধাধীনতায় আনিতে পারিতেছি না। তৎপরিবর্ত্তে আমার অনুভূতি সমূহকে অন্তবিধ কতকগুলি অস্বাভাবিক রূপ-রসাদির আবরণে ঢাকিয়া, তোমার সম্মুখে ধরিতেছি। আম্রের অনুভব করিয়াছি, একথা তোমাকে বুঝাইতে যাইয়া সেই অনুভব-টুকু আমি তোমাকে দেখাইতেছি না; দেখাইতেছি কেবল "আমি আম্রের রস অনুভব করিয়াছি" দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই কয়টী মসী-চিহ্ন অথবা শুনাইতেছি এই কয়টী মসী-চিহ্নের সাঙ্কেতিক শ্রাব্য প্রতিরূপ কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কয়েকটী শব্দ কিম্বা তাহারই অনুকল্পে অপরাপর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কয়েকটী স্পর্শ গন্ধাস্বাদ অনুভব করাইতেছি। এই অনুকল্প-ব্যবস্থায় এক জনের মনের ভাব অন্তকে জানান কতদূর অনিশ্চিত ও ভ্রমসঙ্কুল, তাহার আলোচনা করিব এবং লিখিত ও কথিত-ভাষা-সঙ্কেতকেই আদর্শরূপে ধরিয়া লইব; কেননা রসজা ও ঘ্রাণজা ভাষা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-কল্পনার গর্ভে এখনও ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে এবং স্পর্শজা ভাষা যদিও অন্ধদিগের অঙ্গ-সেবায় ক্রমে হৃষ্টা ও পুষ্টা হইতেছে; তথাপি এখনও সাধারণের উপভোগ্য হইবার উপযুক্ত লাবণ্যলীলাময়ী হইতে পারে নাই।

লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই আমাদিগের মনের ভাব বা অবস্থা অন্যকে বুঝাইবার বা বুঝিতে না দিবার দুইটী অসম্পূর্ণ সঙ্কেত বিশেষ। উভয়ে একই কার্য্য করিলেও এবং একটী অন্যটীর অপেক্ষা না করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও, আমাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কল্পনার বর্ত্তমান অবস্থায় কথিত সঙ্কেতকে মুখ্যকল্পে এবং লিখিত সঙ্কেতকে গৌণকল্পে মনের ভাব প্রকাশ বা গোপন করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। একই সঙ্কেতকে প্রয়োজনমত যখন সত্য-মিথ্যা—দুইই প্রকাশ করিতে ব্যবহার করি, তখন ইহার সাক্ষ্যের সত্যতা আমার কল্পনা ভিন্ন বাস্তবিক হইতে পারে না। ভাষার এই দ্বিবিধ প্রয়োগ হইতে ব্যবহারিক জগতে সত্য-মিথ্যার এতই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যে; কাহারও কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া কোন কিছু বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভাবিত—অন্ততঃ নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন,—"সত্যবাচো দেবাঃ—অনৃতবাচো মনুষ্যাঃ" মনুষ্যমাত্রেই মিথ্যাবাদী; কেননা, মনুষ্য-সকল নিজের অক্ষমতা প্রযুক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক মনের ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে সঙ্কেত শিক্ষা করিয়াছে, তাহা সত্য নহে; সুতরাং

অসত্যকে সত্যবৎ ব্যবহার করিতে যাইয়া, মনুষ্য নিজের অজ্ঞাতসারে তত্ত্বদর্শী মুনি-ঋষির নিকট—মায়াবদ্ধ আত্মা—মায়াতীত আত্মার নিকট চিরকালের জন্য মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভাষায় আর মনের ভাবে পারমার্থিক প্রকাশ্য-প্রকাশক কোন সম্বন্ধ নাই; তবে যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তেমন একটী সম্বন্ধ আছে, বিশ্বাস করি, তাহা সুধু কাল্পনিক,—বাস্তবিক নহে। কেন কাল্পনিক বলি, তাহা দেখাইতেছি। বাণিজ্য-ব্যবহার ক্ষেত্রে বহুরূপী মুদ্রায় যাবতীয় পণ্য বস্তু ক্রয় করিতে পারা যায়; মনো-বিজ্ঞান-জগতেও কথিত ও লিখিত ভাষা দ্বারা সমুদয় মনের ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায়; কিন্তু যেমন কোম্পা-নীর কলের টাকা কোম্পানীর রাজ্যে ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায় না এবং কোম্পানীর কলের নোট কোম্পানীর রাজ্যেও যেখানে সেখানে ভাঙ্গান চলে না; সেইরূপ বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞের নিকট এবং বাঙ্গালা লেখা বাঙ্গালা-লিখনজ্ঞের নিকট ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায় না। যাহারা কথিত ভাষা জানেনা, সেই সকল বালক বালিকার নিকট বলিয়া কহিয়াও কিছু প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, টাকা দ্বারা অন্নাদি অনেক আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে

পারে বলিয়া টাকাকে অন্ন বলা যাইতে পারে না এবং নোটও কিন্তু টাকা নহে। টাকা টাকাই, নোট নোটই, অন্ন অন্নই। আমি টাকা দ্বারা ফল কিনিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম, তুমি নোট ভাঙ্গাইয়া মিষ্টান্ন কিনিয়া ক্ষুধা-শান্তি করিলে; এখন টাকা ও নোট উভয়ের দ্বারাই পরম্পরা-সম্বন্ধে উভয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলেও, উভয়েই কিন্তু আহার্য্যের একই রস অনুভব করিলাম না বা উভয়ের ক্ষুধাও কিছু ঠিক একইরূপে নিবৃত্ত হইল না; অথচ আমরা আহার্য্য-সংগ্রাহক টাকা ও নোটের কাল্পনিক একতায় অথবা ক্ষুধানিবৃত্তির কাল্পনিক ঐক্যে আহার্য্যেরও একতা বুঝিয়াছিলাম। মনোবিজ্ঞান-রাজ্যে আমরা কতকগুলি শব্দের কাল্পনিক একতা এবং সেই সকল শব্দ দ্বারা কতক-গুলি ভাবে অনুভাবিত হইয়া, কাল্পনিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কতকগুলি কাল্পনিক বস্তুর একত্ব বুঝিয়া থাকি এবং ভুলিয়া যাই যে, বস্তু সম্বন্ধে দুই জনের একই প্রকার অনুভূতি হইবার কিম্বা হইয়া থাকিলেও, তাহা জানিতে পারিবার সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারে না।

মনে কর, তুমি আমি দুইজনেই একটা আম্র দেখিতেছি বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; কিন্তু আমরা দুইজনেই কি সেই আম্রটীকে একই কালে ঠিক একইরূপ অনুভব

করিতে পারি? কখনই নহে। তুমি এবং আমি একই সময়ে একই স্থানে থাকিয়া আম্রটীর একই অংশ দেখিতে পারিব না। তুমি এবং আমি উভয়েই আবার প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি। বাল্যে আমি যেমন ছিলাম, এখন আমি তেমন নই। বাল্যে আম্রের রূপ রসাদি যেমন অনুভব করিতাম, এখন তাহা হইতে অন্যরূপ অনুভব করিতেছি। এখনও আবার প্রথম আস্বাদনে আম্রের রসকে যেরূপ তৃপ্তির সহিত অনুভব করি, শেষ আস্বাদনে তৎপরিবর্ত্তে তৃপ্তি-পূর্ণতা-জনিত বিরক্তির সহিত তাহাকে অন্যরূপ অনুভব করিয়া থাকি। একটী কার্য্য প্রথম প্রথম করিতে যে প্রকার সুখাসুখ অনুভব করি, কিছুকাল ধরিয়া সেই কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তেমন সুখাসুখ অনুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ লৌকিক আমিই সকল সময়ে একই পদার্থকে একইমত অনুভব করিতে পারি না। তাহার পর তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ আছে, তাহা বিবেচনা কর। নামে আমি এবং তুমি উভয়েই 'মানুষ' হইলেও, তোমাতে আমাতে রূপে গুণে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং প্রভেদ আছে বলিয়াই আমি আমি, আর তুমি তুমি এবং সেই জন্যই তোমাকে ও আমাকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে কাহারও কষ্ট হয় না। তোমার গঠন, তোমার রূপ, তোমার

দেহায়তন, তোমার জ্ঞানাজ্ঞানাশ্রয়, মানসিক পরিপাক, তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠন ও শক্তি, আমার সেই সকল হইতে কত ভিন্ন! সুতরাং তুমি ও আমি একই বস্তুকে ঠিক একইরূপ দর্শন-স্পর্শনাদি করিব, ইহা সম্ভবপর নহে। যে জন্য তুমি এবং গো, নামে একই 'জীব' পদবাচ্য হইলেও, তোমাতে ও গোরুতে বিস্তর প্রভেদ; তুমি এবং এই কুষ্মাণ্ডটী নামে একই 'বস্তু' পদবাচ্য হইলেও, উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ, সেইজন্য তোমাতে ও আমাতে উভয়ে নামে 'মানুষ' হইলেও কখনও এক নহে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আম্রটীও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে। একমাস পূর্ব্বে মুকুলাবস্থায় তাহার যে রূপ-রসাদি ছিল, আজ পক্বাবস্থায় আর তাহা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আজ সেই পরিবর্ত্তন তাল-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে এই ক্রম পরিবর্ত্তন সূক্ষ্মগণনায় না ধরিবে, সে কিছুতেই এই সুপক্ব আম্রটিকে ঠিক সেই মুকুলেরই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন একবার, ভাবিয়া দেখ যে বিভিন্ন রূপগুণসম্পন্ন নিয়ত অসমপরিবর্ত্তনশীল তুমি এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে একটী আম্রের ভিন্ন ভিন্ন

অংশ প্রত্যক্ষ করিয়া কখনই বাস্তবিক একই অনুভবে পৌঁছিতে পারিব না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; অথচ আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই মিথ্যাময় বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে, আমরা দুইজনে একই বস্তুকে একই রকমে জানিতে পারিতেছি! আমার ভুল কোথায়, একবার দেখা যাউক। আমার প্রথম ভুল এই যে, আমাদের উভয়ের দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন বিভিন্নতা আমি গণনায় ধরি নাই। দ্বিতীয় ভুল এই যে, সেই আম্রটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনুভব করা ভিন্ন যে একই অংশের রূপরসাদি অনুভব করিতে পারি নাই, ইহা বুঝিতে চাই না; তৃতীয় ভুল এই যে, ভোক্তা ও ভোজ্যের বিভিন্নতায় ভোগের বিভিন্নতার অবশ্যম্ভাবিতা হিসাবে না আনিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুভূতিকে কেবল তাহাদের নামকরণের একত্বার দোষে একই অনুভূতি বলিয়া বুঝিয়া লইতেছি। আমি এক পিঠের বর্ণ দেখিয়া তাহার নাম রাখিলাম ধবল, পীত-নেত্র তুমি অন্যপৃষ্ঠের বর্ণকে হরিদ্রাক্ত দেখিয়াও কেবল আমার দেখাদেখি ধবল বর্ণ বলিতেছ। আমি আম্রের একাংশের রসাস্বাদন করিয়া তদনুভূতির নাম রাখিলাম মধুর, আর তুমি তাহার অপর অংশের রস অন্যরূপ অনুভব করিয়াও তাহার নাম রাখিলে মধুর। আম্র হইতে যে সকল গন্ধাণু

আমার নাসাপথে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদিগকে মৃদু গন্ধ বলিলাম, আর তদিতর অন্য কতকগুলি গন্ধাণু তোমার নাসা-মার্গে প্রবেশ করিয়া তোমাতে উগ্রগন্ধানুভূতি জন্মাইলেও তুমি আমার দেখাদেখি মৃদু গন্ধানুভূতি বলিয়া তাহাকে বুঝিলে। উষ্ণ-দেহ আমি আত্র স্পর্শ করিয়া যাহা অনুভব করিলাম, তাহাকে স্নিগ্ধদেহ তুমি অন্যরূপে অনুভব করিয়াও আমার অনুভূতির সহিত একই বলিয়া বিবেচনা করিলে। ফলতঃ আমরা দুই জনেই একই নামের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছি এবং অজ্ঞতা বশতঃ অনুভবের বিভিন্নতার সম্ভাবনা মনে না করিয়া কেবল নামকরণের একতায় উভয়ের অনুভূতির একতা বিশ্বাস করিতেছি। ঠিকই যেন সেই চক্ষুষ্মান পণ্ডিত এবং কাণাকলুর সাঙ্কেতিক বিচার, যাহাতে কলুতে আরোপিত পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত ও কলুতে বিচার—সাঙ্কেতিক বিচার ;—অর্থাৎ কেহ মুখে কোন কথা না বলিয়া ইসারা-ইঙ্গিতে প্রশ্ন ও উত্তর করিবেন। কবিকুলরত্ন কালিদাস এই বিচারে মধ্যস্থ এবং রাজা বিক্রমাদিত্য পাত্রমিত্র সহ এই সভার সভ্য। বিচার আরম্ভ হইল ; পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইলেন, প্রত্যুত্তরে কলু তর্জ্জনী ও মধ্যমা দেখাইল। পণ্ডিতজী তর্জ্জনী ঘুরাইলেন,

কলু হস্তকে সাপের ফণারমত করিয়া দেখাইল। পণ্ডিতজী তাঁহার সাঙ্কেতিক প্রশ্নের কলুকৃত সাঙ্কেতিক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। সভ্যেরা বিচারের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাই সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য রাজা কালিদাসকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস আবার কলুকেই সমুদয় বুঝাইয়া বলিতে কহিলেন এবং কলু বুঝাইয়া দিল যে, পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইয়া তাহার ভালচক্ষুটীও কাণা করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাই সে দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া পণ্ডিতের দুই চক্ষু কাণা করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল; পুনশ্চ, সে ঘানি টানে কি না, পণ্ডিতজী অঙ্গুলি ঘুরাইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করায়, সে তৈল-যন্ত্রের মত হাত করিয়া দেখাইয়া দিয়া ছিল যে, সে স্বয়ং ঘানি ঘুরায় না—কেবল ঘানিগাছের উপরে শুইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিচারের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনিয়া কাহারও মুখে আর হাসি ধরে না; তখন কাব্যকুশল কালিদাস তাঁহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; তাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত মত প্রতিপাদন করিলেন এবং ঘূর্ণায়মান ধরণীকে অনন্তের মস্তকে বসাইয়া রাখিলেন।

ফলতঃ আমি যে সঙ্কেতের সহিত আমার যে মানসিক অবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ ঘটাই, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না

এবং অন্যে সে সঙ্কেতের সহিত তাহার মানসিক সে অবস্থার যেরূপ প্রকাশ্যপ্রকাশক সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা আমার বুঝিবার উপায় নাই। যে বাক্যদ্বারা আমরা পরস্পর পরস্পরকে মনের ভাব জানাইতে পারি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার শব্দাংশ উভয়ের কর্ণে একইরূপ বাজিবার কথা নয়; আর একইরূপ না বাজিলেও—সুতরাং তাহার অর্থাংশ দুই জনের নিকট একই রূপ প্রতিভাত না হইলেও আমরা অজ্ঞতা প্রযুক্তই শব্দাংশের কাল্পনিক একতায় অর্থাংশেরও একতা ধরিয়া লই।

শব্দের উৎপত্তি-স্থানের ইতর-বিশেষে সামান্যতঃ স্বীকৃত একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইবার কথা—হইয়াও থাকে তাই। তারপর শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের পরিপাকের ইতর-বিশেষে একই শব্দকে দুইজনে ঠিক একইরূপে গ্রহণ করিতে পারাও সম্ভবপর নহে। সকলের মুখে সকল কথা সমান আসে না, আবার সকলের কর্ণে সকল কথা সমান বাজে না। তাই পূর্ব্ববঙ্গবাসী 'ঘোড়া' উচ্চারণে আপনার অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বলে যে "ঘোরাকে ঘোরাই বলি, তবে অন্যে শুনিবার দোষে 'ঘোরা' শুনে।"

শব্দের 'স্বরাংশ' বলিয়া আর একটা অংশ আছে, যাহার ইতর-বিশেষে অর্থেরও অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

একই শব্দে নিশ্চয়তার স্বর একরূপ, সন্দেহের স্বর অন্যরূপ; প্রশ্নের স্বর যেমন, উত্তরের স্বর তেমন নয়। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বর একবিধ, বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বর অন্যবিধ। এইরূপ এক এক মানসিক অবস্থায় একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে, মানসিক ভাবের সহিত স্বরের একটা অভ্রান্ত নিত্য সম্বন্ধ আছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক ভাবের সহিত স্বরের সম্বন্ধের অনিত্যতা দেখা গিয়া থাকে এবং সেইজন্য স্বর ধরিয়া একজনের মনের ভাব বুঝিতে যাইয়া আমরা কত সময় ঠকিয়া থাকি। নাটকাভিনয়ে কোন অভিনেতার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার নিজের দুঃখ ভোগ অনুমান করা সঙ্গত নহে। পুনশ্চ, তাহাকে হাসিতে দেখিলেও তাহাতে তাহাকে সুখী জ্ঞান করায় তুমি ভুল বুঝিবে। বিচারক সকল সময় আসামীর কাঁদাকাটী শুনিয়া বা তাহার নির্ভীকতা দেখিয়া তাহাকে নির্দোষী স্থির করিতে পারেন না।

এখন শব্দের অর্থাংশের বিষয় একবার চিন্তা কর। শব্দের অর্থাংশ দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ভাব বা বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শব্দের অর্থ বুঝিয়া একজন অপরের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে;

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমাদের এ বিশ্বাসটীও ভ্রান্তি-মূলক। শব্দের অর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনঃকল্পিত মাত্র; সুতরাং একের মনঃকল্পিত অর্থের সহিত অন্যের মনঃকল্পিত অর্থের ঐক্য হইবার কথা নহে। তবে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তিতায় শব্দের একতায় বিশ্বাস করিয়া থাকি। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কল্পনা করায়, দুইজনে একই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া যে প্রতিদিন কত বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে, আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না; কেননা শব্দের অর্থান্তর-বোধে যে জগতে ভয়ানক অনর্থ ঘটিতেছে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, সমুদয় শব্দময় পদার্থই তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। এখন আমি কেবল সর্ব্ববাদি-সম্মত একই শব্দের ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত একই অর্থের ভিন্নার্থ সম্ভাবনার স্থল দেখাইব।

আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেই জ্ঞানটী প্রকাশ করিতে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করিব, সেই শব্দের অর্থাংশ সেই জ্ঞানের প্রতিরূপ। কিন্তু কোন বস্তু সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হয়, সেই বস্তু সম্বন্ধে তোমারও ঠিক সেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা তোমার ও

আমার ইন্দ্রিয় নামে এক হইলেও তাহারা বস্তুতঃ এক নহে এবং তাহাদের কার্য্যও ঠিক একরূপ নহে। তদুপরি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা মনে কর। সুরাপান করিয়া আমার মনের যে ভাব হইল, আমি তাহার নাম রাখিলাম নেশা। কিন্তু হয় ত সুধাপানে আমার যেরূপ মনের সুখাসুখ হয়, তাহা তোমার সুখাসুখ হইতে অনেক বিভিন্ন। আমি সুরাপান করিয়া একটা দিন হাসিয়া কাটাইলাম, তুমি সুরাপান করিয়া একটা দিন কাঁদিয়া কাটাইলে। আমি সুরাপান করিয়া সৃষ্টি-রহস্যের ধ্যানে রহিলাম, আর তুমি রমণীর অধর-সুধাপানে উন্মত্ত হইলে; সুতরাং সুরা সম্বন্ধে আমরা দুই জনে দুই প্রকার অনুভব করিয়াও উভয় অনুভূতিকেই 'নেশা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া উভয়ের একতা বুঝিয়া থাকি! পলাণ্ডুর গন্ধে আমার ঘৃণা জন্মিল, আর তোমার জিহ্বা লালায়িত হইল; অথচ এই দুই নিতান্ত বিসদৃশ অনুভূতিকে পলাণ্ডু শব্দ বা নাম দ্বারা একইরূপ বুঝিলাম। দুগ্ধ ও ঘৃতের গন্ধ আমার নিকট যেমন প্রীতিপ্রদ, ব্রহ্মবাসীদের নিকট তেমনি বা ততোধিক অপ্রীতিকর, তবুও এই নিতান্ত বিসদৃশ অনুভূতি-উৎপাদক গন্ধ একই দুগ্ধ বা ঘৃতগন্ধ নামে অভিহিত হয়। যে বিলাতী পনীরকে (cheese) সাহেবেরা অতি উপাদেয়

জ্ঞান করেন, কত বাঙ্গালীর নিকট তাহা বিস্বাদ, দুর্গন্ধ এক আজগবী পদার্থ। কিন্তু সেই খাদ্যের রসাস্বাদ সম্বন্ধে সাহেব ও বাঙ্গালীর বিস্তর মত-ভেদ থাকিলেও উভয়ে তাহার রসাস্বাদ বা আঘ্রাণ দ্বারা একই নাম প্রদান করিতেছে। বিড়ালাক্ষ সাহেব একই গোলাপের বর্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণতার বাঙ্গালীর সঙ্গে একইরূপ অনুভূতিতে পৌঁছিতে না পারিলেও, দুই বিসদৃশ বর্ণানুভূতিকে একই 'গোলাপী' বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করিতেছে।

বীরের বীরত্বে নাচে বীরের হৃদয়,
ভয় ভীরুর অন্তরে।
মেঘের গর্জ্জনে নাচে কেশরী দুর্জ্জয় ;
মৃগ প্রবেশে বিবরে।

অতএব একই শব্দকে ভীরু ও বীর দুই স্বতন্ত্র প্রকারে অনুভব করিলেও, একই রণবাদ্য 'বলিয়া তাহার নাম দিতেছে। তরুণীর স্তন স্পর্শে তার পুত্র যে প্রকারের সুখ পায়, ঐ পুত্রের পিতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সুখানুভব করিলেও উহার নাম বা সংজ্ঞা বিষয়ে স্তনন্ধ তুল্যরূপই বটে।

বালক তাহার মাতৃবক্ষ দর্শনে ও স্পর্শনে যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার পিতাকে সে তাহা বুঝাইতে পারিবার

কথা নয় এবং পিতাও তৎপুত্রের জননীবক্ষ দর্শন ও স্পর্শনে যে সুখানুভব করেন, তাহা বালককে বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ ভাষা-ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-প্রকাশক সঙ্কেত-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বাস্তবিক সত্য নহে এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে, তাহারই উপর ভাষার গোড়াপত্তন কাজেই মূলের অসত্যতা জন্য তদারূঢ় অট্টালিকার বুনিয়াদও আল্‌গা হইয়াছে, তাই সামান্য সন্দেহের ঝড়েই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

আমরা অনেক পদার্থের অনেক বিষয় বুঝিতে পারি না; আবার যে পদার্থের যে টুকু বুঝি, তাহা নিরপেক্ষ-সত্য নহে। তারপর সেই যে টুকু বুঝি, তাহাও প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং অন্যকে বুঝাইতে পারি না। যদি সকলে সকল বিষয় বুঝিত এবং বুঝাইতে পারিত, তবে সাধারণের স্বীকৃত একই বিষয় লইয়া এত গোলযোগ—এত মত-ভেদইবা কেন হইবে? বস্তুতঃ সকল ব্যক্তি যে একই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, তাহা বাস্তবিক নহে,—সুধু কাল্পনিক এবং সেই কল্পনা আমার কল্পনা-সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র।

সোঽহম্ ব্রহ্ম।

আমার জ্ঞান-গোচরে কেবল আমি আছি; আর আমি ব্যতীত যত কিছু, সবই আমার কল্পিত! সেই কল্পিত পদার্থ সকল যে অন্যে আমার মত কল্পনা করিতে পারে, ইহাও আমার কল্পনার অন্যতর অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা সকলেই আমার কল্পিত; আর আমার কল্পিত তোমরা আমার মত কল্পনা কর কখন? না—আমি যখন কল্পনা করি, যে তোমরা আমার মত কল্পনা করিতেছ! পক্ষান্তরে, আমার কল্পনার সহিত তোমাদের কল্পনা মিলে না কখন? না—যখন আমি ভাবি, যে তোমরা আমার মত ভাবিতেছ না। তোমরা যেমন আমার কল্পিত, তোমাদের কার্য্যগুলিও তেমনই আমার কল্পিত। তোমাদের প্রত্যেক কার্য্য (আমার কার্য্যের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক) আমারই কল্পনা। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত কিছু দেখিতেছি, সকলই আমারই কল্পনা।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা॥
শরীরং স্বর্গ-নরকৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যংচিদাত্মনঃ॥

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীনস্তেব ধাবনম্॥

ব্যবহারিক কল্পিত জগতে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সৌরকর-তাপিত বায়ুতে যেমন জল ভ্রম-জনক মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনই আমারই প্রভাময়ী ঈক্ষণীশক্তিতে পারমার্থিক ভাবের অভাবকালের "আলো-আঁধারিতে" আমিই আমা হইতে পৃথক্‌বৎ বিশ্ব-রূপের কল্পনা করিয়া থাকি। এমন কি, আমার দেহ, স্বর্গ-নরক-ভাবনাগত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ-ভয় ইত্যাদি সকলই আমার কল্পনার লীলা-খেলা; সুতরাং চিদাত্মা আমার পক্ষে এই কল্পিত মায়িক বিশ্বের সম্বন্ধাধীন সাংসারিক কোন কার্য্যেরই বাস্তবিকতা নাই। যেমন "জলের বিম্ব জলে উদয়—লয় হয় সে মিশে জলে" তেমনই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব আমাতেই উদিত ও বিলীন হয়। এহেন বিশ্বের বাস্তবিকতা-নিরূপণে পণ্ডশ্রম বৃথা। পরমার্থতঃ আমি ছাড়া আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থ এবং সেই সমুদয় পদার্থের যাবতীয় ক্রিয়া আমারই কল্পিত; সুতরাং আমার কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সূক্ষ্ম-সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমিই! কি সুখকর কল্পনা!! এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার অন্বেষণ

করিতেছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে যে, আমি ভিন্ন এই জগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাই নাই! এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই আমার কল্পিত—আমারই সৃষ্ট; সুতরাং আমিই এই সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম!

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।"

সোঽহং ব্রহ্ম,—কি সুখকর কল্পনা! এই প্রকার কল্পনা যখন প্রতীতিতে অভ্যস্ত হইবে, তখন কত সুখী হইব! এই প্রকার কল্পনা অভ্যস্ত হইবার পর যখন মনে—আমার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিবে যে, এই বিশ্ব আমার কল্পিত বা সৃজিত, তখনই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—ব্রহ্মে লীন হইয়া—ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব!!

জগতের কাল্পনিকতা।

এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত দূর সত্য, তাহা আরও একটু ভাল করিয়া আলোচিত হউক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন পদার্থকেই যে তাহার প্রকৃত অবস্থায় জানিতে পারি না,

ইহা পুর্ব্বে যত দুর সম্ভব, পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন দেখাইতে চাহি যে, কোন পদার্থের কোন অবস্থা দূরে থাকুক, কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর, আমার সম্মুখে একটী পক্ক আম্র রহিয়াছে। এই আম্রটী যে রহিয়াছে, ইহা আমি কি করিয়া জানি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা উহার অস্তিত্ব কি আমি জানিতে পারিতেছি? কখনই না। বুঝিতেছি যে, আমি বড় জোর রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছি এবং ইহার অধিক আর কিছুই অনুভব করিতেছি না; অথচ ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি একটী বাহ্য বস্তুতে আছে। রূপ রসাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আছে, ইহা ধরিয়া লইবার আমার কি যুক্তি আছে? রূপাদিকে আমি বাহ্য বস্তুর গুণ বলিতেছি, অথচ বাহ্য পদার্থকে রূপাদিগুণ ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানিতে পারা যায় না। দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, দ্রব্য ও গুণ, এ উভয়কেই পৃথক্ ও একত্র, এতদুভয় প্রকারেই জানা উচিত; কিন্তু যখন দ্রব্য ও গুণকে পৃথক্ করা যায় না, অর্থাৎ গুণহীন দ্রব্যকে কিছুতেই অনুভবে আনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রব্য (গুণী) ও গুণ একই পদার্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিকও আমি

আম্র-ফলের অস্তিত্ব কিছুই জানিতেছি না, জানিতেছি কেবল রূপ-রসাদির অস্তিত্ব, এবং ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ মদিতর একই স্থানে বা দ্রব্যে আছে। আমার রূপজ্ঞান হইল; আমি মানিয়া লইলাম যে, ঐরূপ আমার সম্মুখস্থিত একটী দ্রব্য হইতে আসিল। আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, ধরিয়া লইলাম যে ঐ গন্ধ আমার সম্মুখস্থিত সেই দ্রব্যটী হইতেই আসিল। আমি প্রথমে একটী কল্পনা করিলাম, পরে দ্বিতীয় কল্পনা-টীকে প্রথমটীর সঙ্গে যুক্ত করিলাম। হস্ত-চালনা করিয়া স্পর্শানুভব করিলাম, এবং তৃতীয় বার কল্পনা করিলাম যে, সেই রূপ-গন্ধের সংযোগ-স্থানেই এই স্পর্শ মিলিত হইয়াছে। তাহার পর একটী শব্দ শুনিলাম, আর অমনি ধরিয়া লইলাম যে, শব্দটীও রূপ-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধিস্থান হইতেই আসিল। ইহার পর কল্পিত সন্ধিস্থান হইতে রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তুলিয়া আনিয়া মুখে দিয়া রস অনুভব করিলাম, এবং ধরিয়া লইলাম যে, রূপ-রসাদি পঞ্চ অনুভাব্য বিষয় সমুদয়ই একত্র একই দ্রব্যে থাকে, এবং সেই দ্রব্যটী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপাদিও স্থানান্তরিত হয়। এ সকলই কল্পনার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আম্রটীর অস্তিত্বই কাল্পনিক।

আমি আমার কয়েকটী কল্পনাকে একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যে একটী কল্পনা-কেন্দ্র রচনা করিয়াছি, তাহাই আম্র! কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বন্ধীয় কল্পনাকে একটী কেন্দ্রনিবিষ্ট কল্পনা করায় আম্রের উৎপত্তি। আমার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-গ্রন্থির নাম আম্র; ইহা ব্যতীত আম্রের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই।

কথাগুলি একবার অন্য রকমেও আলোচনা করা যাউক। আমি একটী রূপ দেখিতেছি; অসতর্কভাবে যাহাকে আম্রের রূপ বলি, আমি তাহাই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আম্রের রূপ অনুভব করিতেছি বলিয়াই কি আম্রের বাহ্য-দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে? যদি দ্রব্য-ধাতুগত-আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্য প্রকার বিন্যাস জন্য যখন একটা আম্রকে দুইটা বলিয়া চাক্ষুষ অনুভবে বুঝি, তখন কি পূর্ব্বানুভূত বাস্তব আম্র পরের অনুভূতি মত একটী বাস্তবিক দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল? অর্থাৎ একটী আম্র আবার সময়ান্তরে দুইটী হইয়া দাঁড়াইল? যুগল নেত্রের যে প্রকার বিন্যাসে সাধারণতঃ স্বীকৃত একটী বাস্তব পদার্থকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকারে মানবচক্ষু চিরবিন্যস্ত থাকিলে, এখনকার চির-একটী-বস্তু তখন চির-দুইটী-বস্তুরূপে সত্য বলিয়া অনুভূত

হইত না কি ? কিন্তু আমি কি মনে ধারণা করিতে পারি যে, যেই আমি ভ্রূ-কুঞ্চনে চক্ষুর্দ্বয়কে পৃথক্ করিলাম, আর অমনি একটী বস্তু বাস্তবিকই দুইটী হইয়া দুই স্থানে শোভা পাইতে লাগিল ? অবশ্য আমি সেরূপ ধারণা না করিয়া অন্ততঃ একটী আম্রকে অবাস্তবিক জ্ঞান করি, কিন্তু যেখানে দুইটীর মধ্যে একটী বস্তু আর একটী অবস্তু বলিয়া আমার জ্ঞান হইবে, সে স্থানে আমি কোন্‌টীকে বস্তু আর কোন্‌টীকে অবস্তু বলিব ? চক্ষু আমার এ সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না ; হস্ত দ্বারা কি সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি ? আচ্ছা—একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া আম্রটীকে স্পর্শ করিয়া দেখি। একি ! আমার হস্তও যে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল ! ! আমার কোন্ হস্ত বাস্তবিক, আর কোন্ খানি অবাস্তবিক ? হস্ত দ্বারা দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্র দ্বয়ের কোন্‌টী মিথ্যা স্থির করিবার পূর্ব্বে আমার হস্ত-যুগলের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কি করিয়া আমি এ সন্দেহ ঘুচাইব ? দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রটীতে আমার দ্বিত্বপ্রাপ্ত হস্ত সংলগ্ন হইয়া, আমার স্পর্শ-জ্ঞানকেও যেন দ্বিত্বপ্রাপ্ত করাইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে, আমি স্পর্শ করিয়া কিছু দুইটী আম্র অনুভব করিতেছি না ; দৃষ্টিতে আম্র ও হস্তকে দ্বিত্বপ্রাপ্ত বোধ হইলেও স্পর্শ-জ্ঞান

একই হইতেছে ; কিন্তু সেই স্পর্শের একত্বে কি দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রের বা হস্তের কোন্‌টী বাস্তবিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম ? যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তবে স্পর্শে আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই হইল, স্পর্শ দ্বারা বাস্তবিক রূপের বা অবাস্তবিক রূপের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি রূপ, হস্ত দ্বারা অনুভব করিতেছি স্পর্শ ; সুতরাং চক্ষু যাহা অনুভব করিতেছে, হস্ত তদিতর অন্য কিছু অনুভব করিতেছে, কাজেই উভয়ের সাক্ষ্যের একতাই মূলে নাই। বস্তু-তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় বোধ-বিড়ম্বনা এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্পর্শ-জ্ঞানের সমালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পর্শজ্ঞানের বিষয়টী বাহ্য বস্তু নহে ; প্রত্যুত আমাদের শরীরেই এক প্রকার চেতনাবস্থার কার্য্য, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব হইলেও আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কেননা, বাহ্যজগৎবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন যে, কোন এক পদার্থ অন্য এক পদার্থকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করিতে পারে না ; এমন কি, কোন এক জাতীয় পরমাণুকেও স্পর্শ করিতে পারে না। কোন দুইটী পরমাণু, কোন দুইটী অণু, কোন দুইটী পদার্থ, যতই ঘেঁসা-

ঘেঁসি করিয়া থাকুক না কেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু না কিছু অন্তর বা ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং আমার দেহের কোন এক বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারা দূরের কথা, আমার দেহেরই এক অংশ অন্য অংশকে স্পর্শ করিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় দেহ অন্য বস্তুর সহিত সংঘৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইল বিবেচনা করিলেও, আমার দেহ ও সেই বস্তু, এতদুভয়ের মধ্যে অন্তর থাকিবে, এবং সেই অন্তর বা শূন্য স্থানটী আমাদের দেহের নিকটতর, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্পর্শ দ্বারা বাহ্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করা সম্ভবপর হইলে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বক্ষণে সেই একমাত্র শূন্যের ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করার সম্ভাবনাই নাই।

আর স্পর্শই কি অভ্রান্ত? স্পর্শ করিয়া স্থলবিশেষে অনেককে এক বলিয়া বোধ হয় এবং এক স্পর্শকে অন্য স্পর্শ বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে। একখানি চিরুণীর দন্ত সমুদয় গাত্রে স্পর্শ করাইলে, দন্তের সংখ্যানুসারে অনেক্-স্পর্শ-জ্ঞান না হইয়া একই অবিচ্ছিন্ন স্পর্শজ্ঞান হয়; একই স্পর্শ পদতলে একরূপ, কক্ষ-তলে (বগলে) অন্যরূপ সুড়সুড়ীর অনুভব জন্মায়, এবং মস্তকে বা পৃষ্ঠে তৃতীয়রূপ অনুভব জন্মায়, তবে ভ্রান্ত স্পর্শকে জানিয়া

শুনিয়া কিসে অভ্রান্ত বোধ করিবে? আম্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী রসনেন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিতে চাও? আচ্ছা দেখ দেখি সেই বা এসম্বন্ধে কি বলে। রসাস্বাদন করিয়া কি তুমি বলিতে পার যে, সেই দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রদ্বয়ের কোন্‌টীর রস তুমি অনুভব করিলে? অপর, রসনেন্দ্রিয় কি কোন বস্তুর সংখ্যা বা বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্য দিতে পারে? রসনেন্দ্রিয় পরের রসানুভূতির ক্ষণিক বর্ত্তমানতার সাক্ষ্য দিতে পারে। সেই অনুভূতি কোথা হইতে কেমন করিয়া হয়, রসনেন্দ্রিয় তাহা বলিতে পারে না। রসানুভূতি এক কথা, আর রস যাহাতে থাকে বল, তাহা অন্য কথা। জিহ্বায় আম্র রাখিয়া বলত তাহার কি রস? যাহাকে তুমি বাস্তবিক আম্র বল, তাহার রূপ দেখিলে, বাহ্যাংশের রসানুভব করার সময় সে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ একটী অংশ গ্রহণ করিলে, সুতরাং যাহার রূপ দেখিলে, তাহার রস অনুভব করিলে, এ কথাই বা কি করিয়া বল? পূর্ব্বদৃষ্ট যে আম্রটী চিবাইয়া রস অনুভব করিয়াছ, এখন সেই আম্রটীর রূপ দর্শন করিয়া বল ত ইহা পূর্ব্বের মত দেখায় কি না। ফলতঃ রসানুভব দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সাক্ষীর স্থলে দাঁড় করাইবে; সেও ত বাহ্য

পদার্থের কোন কথা বলিতে পারে না। গন্ধ কি, সে তাই জানে না! মনে কর, ঐ আম্র দশ হাত দূরে রহিয়াছে, উহা হইতে অদৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, অশ্রুত, অনাস্বাদিত যেন কি আসিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণানুভূতি জন্মায়, একথা বলিবার কি হেতু আছে? গন্ধই কিছু আম্র নহে; গন্ধ আম্র হইতে একটী স্বতন্ত্র কিছু, যাহা আম্র দর্শন করিয়া কি স্পর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া কি রসানুভব করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই। সুতরাং গন্ধ যে তোমার সম্বন্ধে বাহ্য কোন পদার্থ, তাহাই তোমার জানা নাই; অথচ তুমি সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাক্ষীর একরূপ সাক্ষ্যকে অন্যরূপ কেন বুঝিয়া লও? তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিল যে, সে একটা গন্ধানুভব করিতেছে; কিন্তু তুমি বলিলে সেই গন্ধটা দূরস্থিত কোন দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এবং যাহা হইতে আসিতেছে, সে পীত বসন পরিয়াছে, তাহার শরীর কোমল এবং তাহাকে মুখ-গহ্বরে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিলে রস পাইবে। তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাক্ষী যতটুকু বলে নাই বা যতটুকু বলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, কেন তুমি নিজে নিজে ততটুকু ধরিয়া লও? আম্রের বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লও, তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিবে না; কেননা

শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে; সে শব্দটি কোথা হইতে আসিল, সে তাহা বলিতে পারে না। তুমি ধরিয়া লইলে যে, ঐ দশহস্ত-দূরস্থিত আম্র-যুগল হইতেই শব্দ আসিল। শব্দ রূপ-রসাদির অপরিচিত, সুতরাং তাহাদের বলিবার অধিকার নাই যে সে শব্দ কি, এবং তাহা কোথা হইতে আসে।

যাহাহউক, এই আম্র-যুগলের বাস্তবাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কথা বলে না। চক্ষু কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা রূপ অনুভব করিতেছে; স্পর্শ এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা স্পর্শানুভব করিতেছে; নাসিকা কহিতেছে যে, সে একটা গন্ধ পাইতেছে; রসনেন্দ্রিয় বলিতেছে যে, সে একটা রস অনুভব করিতেছে, এবং কর্ণ বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম সাক্ষ্য দিল, এবং কোন এক সাক্ষীও অন্যের অনুভূত বিষয় বুঝিতে পারে নাই, এরূপ স্থলে পাঁচজনে একই কথা বলিতেছে, কি করিয়া বল? আবার উক্ত আম্র-যুগলের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, আর কোন্‌টি বা অপ্রকৃত, এত প্রমাণ লইয়াও কি একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছে? দেখ; একবার ভাবিয়া দেখ, কি সঙ্কটে উপনীত হইয়াছ! সম্মুখে আম্র-যুগল

রহিয়াছে, ইহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা, কিন্তু কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারিতেছ না; অথচ বলিবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, ইহা কতদূর অসঙ্গত!

আম্রের অস্তিত্ব যে বাস্তব নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, বলতো আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি পীতাভ সবুজ;—আম্র নানা রঙ্গের হইতে পারে। কোন আম্র নমনীয়; কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল, কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন আম্র বর্ত্তুল, কোনটি দীর্ঘল, কোনটি ঠুটি, কোনটি চেপ্‌টা, তাই বলিতেছি যে, তোমার দ্রব্য-ধাতুবিশিষ্ট বাস্তব আম্রের প্রকৃত কোন রূপ নাই। একটি নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি মধুটকি, কোনটি গোপাল ভোগ, কোনটি নির্ভাজ টক, কোনটি "পান্‌সা," কোনটি অম্ল-মধুর। গন্ধও অবশ্য সকলের এক রকম নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি স্পর্শ, এই নানা প্রকার গুণ কল্পনার সংমিশ্রণে তোমার ইচ্ছানুসারে একটা

নাম দিয়া ডাকিতেছ না কি? একটি বস্তু হইতে অপর একটি বস্তু রূপে, রসে, গন্ধে,স্পর্শে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে একই 'আম্র' নামে অভিহিত করিতেছ।

আবার দেখ, আজ যে আম্রটিকে দেখিলে, এক মাসের পর তাহাকে দেখিয়া, তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ! ভিন্ন সময়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এত বাস্তব বিভিন্নতা দেখিয়া, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি রহিল, বল দেখি? বস্তুতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা তদিতর বাহ্য কোন কিছুর দ্রব্য ধাতুনিষ্ঠ বাস্তব সত্ত্বা অনুভব করা যায় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব জানা না গেলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং সেই সঞ্চালনের প্রতিরোধক জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্যজগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু কথাটা কি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নহে? আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সময়ে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হই বটে কিন্তু বাধার কারণ যে তদিতর বাহ্য পদার্থ, তাহা কি করিয়া বলি? মনে কর, একজন জন্মাবধি চতুরিন্দ্রিয়বিহীন, তুমি তাহার গাত্রে একটা ধাক্কা দিলে,

এই ধাক্কা যে সে বাহির হইতে পাইল, এ জ্ঞান কি তাহার স্পর্শজ জ্ঞান? মনে কর, তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতেছ, তোমার বক্ষদেশ একবার প্রসারিত ও একবার কুঞ্চিত হইতেছে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছ, কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা কি তুমি বায়ু-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছ? দেহাবরকের অন্তর্দ্দিকে অভ্যন্তরস্থ পদার্থরাশির বিস্তরণ-চেষ্টা এবং বহির্দ্দিকে বহিঃস্থ ভূ-বায়ুর চাপ সাধারণ চাপ নহে। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪॥; সুতরাং সমুদায় দেহের ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭৫ মণ ভার! ইহার কি কিছু অনুভব কর? কখনই না,—কর কেবল অনুমান, কর কেবল কল্পনা। বস্তুতঃ এই বাধা-উৎপাদক ইন্দ্রিয়-দল আদপেই বাহ্য জগতের কোন খবর বলে না; বলে কেবল আপনার নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা; কিন্তু তুমি তাহা হইতে ধরিয়া লইতেছ যে, তোমার এই বাধা-জ্ঞানটি বাহ্য কোন পদার্থের সঙ্গে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকলের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে হইল। একটি বস্তুকে হস্ত দ্বারা তুলিতে আমার হস্তস্থ পেশীতে একটা টান পড়িল; এই টান যখন বেশি হয়, তখন দ্রব্যটাকে গুরু বলি, এবং টান যখন কম হয়, তখন দ্রব্যটাকে লঘু বলি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে,

দ্রব্যের অস্তিত্ব আর একটা টান-জ্ঞান, দুইই স্বতন্ত্র বিষয়। কলেরার সময় যখন হাত পা টানিয়া ধরে, তখন তো আমাদের একটা টান-জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহাতে কি কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি?

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার দুর্ব্বল অবস্থায় যে পদার্থকে যত ভার জ্ঞান হইবে,—অর্থাৎ যে টানকে যত বড় টান বোধ হইবে, সবল অবস্থায় সে পদার্থকে তত ভার কিম্বা সে টানকে তত বড় টান জ্ঞান হইবে না। আবার সেই একই দ্রব্য আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতে আমি যে ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব, বাহু দ্বারা আকর্ষণাদি করিতে তেমন ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব না। আম্রটীকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া ঝুলাইলে, যে ক্লান্তি অনুভব করিব, বাহুমূলে ঝুলাইলে, তাহা হইতে অন্যরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব। মল-মূত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে, একপ্রকার অননুভূত অনুভূতি জন্মায়, কিন্তু স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে, গুরু, লঘু, কঠিন, কোমল, স্থির, চলিষ্ণু, ইত্যাদি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অন্নরাশি উদর-প্রাচীরের অঙ্গে এবং অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়া কেমন বিসদৃশ অনুভূতি উৎপাদন করে! ফলতঃ টান বা বাধা-

জ্ঞানের প্রতি কারণ যদি বাস্তব বাহ্য বস্তু হইবে, তবে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই অপরিবর্ত্তিত একই বাহ্য বস্তুকে বিভিন্নমত বোধ হইবে কেন?

এখন একবার স্বপ্নসময়ের পৈশিক জ্ঞানের অবস্থাটিও ভাবা উচিত। আমি স্বপ্নসময়ে কাগজ—কলম—কালী লইয়া লেখা-পড়া করিলাম। অবশ্যই আমার পৈশিক ইন্দ্রিয় বাহ্য কাগজ—কলমের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমি কাগজ—কলমের তদানীন্তন বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই!! অথবা স্বপ্নে আমি একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া খরতর করবাল করে কত শত শত্রু সংহার করিয়া বহুবিধ বাধা ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সেই যুদ্ধ-ব্যাপারকে আদ্যন্তই অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন কতবার কতপ্রকারে হস্তপদাদি বিক্ষেপণ করিয়া কত রকমে কত কত বাধা পাই, কিন্তু এ সকল বাধার কোন জ্ঞানই আমার হয় না। পুনরপি স্বপ্ন সঞ্চরণ কালেও কতপ্রকারে হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া সত্যসত্যই কত কার্য্য করি, এবং তৎকালে তাহাতে আমার বাধার জ্ঞান হইলেও, স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সে সকল বাধার বিন্দুমাত্রও আমি স্মরণে আনিতে পারি না! পুনশ্চ, সম্পূর্ণ জাগ্রত কালেও

কত সময় 'মনোমহনবস্থানাৎ' কতপ্রকার বাধা পাইয়াও সে বাধা অনুভব করিতে পারিনা। এমন কি, আমার একটী অঙ্গ ছিন্ন হইলেও তাহা না জানিতে পারি! কত সময় দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে কত প্রকার ধারাল কাচ-কঙ্করাদি পদার্থে আহত হইয়া চরণ ক্ষত হইয়াছে, স্রোতো-বেগে শোণিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎকালে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুভব করিতে পারি নাই। ফলতঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন এক সময়ে বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষে আমার বাধা-জ্ঞান হয়, তেমনি অন্য সময়ে বাহ্য বস্তুর অবর্ত্তমানেও আমার বাধা-জ্ঞান হয়। যদি আমার বাধা-জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে কোন কোন সময়ে বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়, এবং কখনও বাহ্য বস্তুর বাধা বর্ত্তমানেও আমি তাহা অনুভব করিতে না পারি, তাহাহইলে বাহ্য বস্তুর সহিত বাধাজ্ঞানের কার্য্য-কারণরূপ অবশ্যম্ভাবী নিত্য সম্বন্ধ থাকে কৈ?

আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব যে আমার ভ্রান্তি, তাহা বিবেচনা করিবার পক্ষে আরো কারণ আছে। আম্রটী দূরে রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে নানা আকারে বর্ণ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার যে কিছু অংশ আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল ইন্দ্রিয়ে সমান ঘা মারিলেও,

কেবল তাহার ক্ষুদ্রতম দুইটী স্বতন্ত্র অসমান তরঙ্গের এক একটী এক এক চক্ষে গৃহীত হইল। আম্র যত বড়ই হউক না কেন, আমার চক্ষু দুইটীর অত ক্ষুদ্র স্থানে সেই বর্ণ-তরঙ্গের কতকটা চক্ষুগত পদার্থে আলোচিত হইয়া অবশিষ্টাংশ সমতল ক্ষেত্রবৎ ক্ষুদ্র ও বিপর্য্যস্ত চিত্রে অঙ্কিত হইল। সেই চিত্রদ্বয় হইতে আবার তরঙ্গ উঠিয়া তরঙ্গাকারে আমার দর্শন-স্নায়ুদ্বয়কে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত করিল, এবং সেই স্পন্দন আমার মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া কখনও একটী—কখনও দুইটী সমবর্ণের অবিপর্য্যস্ত বৃহৎ ঘন-ক্ষেত্রের রূপ-জ্ঞান জন্মাইল !! কিন্তু আমার দর্শন-স্নায়ুর স্পন্দন কি আমি কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি? আম্র হইতে তরঙ্গ আসিয়া আমার চক্ষে ঘা পড়িল, তাই কি আমি বুঝিতে পারিলাম? যে সকল ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আমি আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছি, সেই সকল ক্রিয়াই যখন মূলে আমার বুঝিবার উপায় নাই, তখন সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত আম্রের বাস্তবাস্তিত্বের নিত্য-সম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকার করি? পুনশ্চ, এখন জাগ্রত অবস্থায় যে ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাই, স্বপ্নকালেও ঠিক সেই সকল ক্রিয়া হইলেও তথাদৃষ্ট আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করি না !!

আমি শব্দ শুনিলাম—আম্রে কোন পদার্থ সংঘর্ষিত হইয়া তাহার পরমাণুরাশি বহুরূপে স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন বায়ুসাগরে সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাহারই অল্পাংশ আবার সকল ইন্দ্রিয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রতিঘাত হইলেও, কেবল দুইটি তরঙ্গ আমার দুইটি কর্ণের পটহে (অবশ্য অগ্র-পশ্চাৎভাবে) প্রতিহত হইল, আর তাহা হইতে নাকি আবার একই প্রকারের দুইটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ-স্নায়ুদ্বয় দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে মস্তিষ্কে নীত হইয়া জন্মাইল কি না শব্দ!! আমি শ্রবণ-স্নায়ুর কোন আন্দোলন অনুভব করিতে পারিলাম না—কর্ণ-পটহের স্পন্দন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত শব্দের অস্তিত্ব সুধু নহে—শব্দাধারের বাস্তবাস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলাম!!

আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, তাহাই বা কিরূপে? আম্র হইতে কি একটা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ছড়াইয়া পড়িলেও, এবং অন্য সকল ইন্দ্রিয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, কেবল নাসিকাই তাহার কিছু গ্রহণ করিল, আর তাহা তরঙ্গাকারে আঘ্রাণ-স্নায়ুযোগে রূপান্তরিত ও মস্তিষ্কে নীত হইয়া—জন্মাইল গন্ধ। আমি রস অনুভব করিলাম; আম্রটী

আমার সর্ব্বাঙ্গে স্পৃষ্ট হইলেও কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার রসানুভব করিল না, কেবল জিহ্বাই নাকি কি একটা তরঙ্গকে রসন-স্নায়ু-যোগে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া রসের জ্ঞান জন্মাইল !! স্পর্শ দ্বারাও আমি আম্রের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না; আম্রকে স্পর্শ করিয়া, টানিয়া বা ঠেলিয়া গুরুত্বাববোধকতাদি যে কয়প্রকার পৈশিক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতেও আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব জানিবার কোন কথা নাই। স্পর্শ দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না; গতি বা স্থিতি বোধ-জ্ঞান দ্বারাও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জানা যায় না। গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে; তাহা চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞান বাহ্য বস্তুর পদার্থগত অস্তিত্বের কোন কথা বলিতে পারে না, এবং পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সাহায্যে অনুমানলব্ধ গতি বা স্থিতির জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ কোন বাস্তব বাহ্য পদার্থ নহে। বাধা-জ্ঞান প্রতিকূল গতি দ্বারা নিজ গতির রোধে জন্মে; সুতরাং বাধা-জ্ঞানের মূলে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে,

তবে তাহা গতি বা স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্ধ, সম্পূর্ণরূপে দর্শন-শক্তিহীন, এখন যদি আমি চলিতে থাকি, তবে আমার গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির গতি-জ্ঞান হইতে অনেকটা অন্য প্রকার। আমি গতি দ্বারা যে স্থান অতিক্রম করিতেছি, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া, কেবল পর্য্যায়ক্রমে (চরণের পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ জন্য) এক প্রকার ক্লান্তি এবং (ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত জন্য) এক প্রকার স্পর্শ জ্ঞান হইতে থাকিবে। এইরূপে আমি চলিয়া যাইতেছি, ইতিমধ্যে একখানি স্থির শকটে স্পৃষ্ট হওয়াতে আমার আবার অন্যরূপ স্পর্শ-জ্ঞান জন্মিল; তাহার পর একটু বল-প্রয়োগ করিলে, সেই স্পর্শ ক্রমে দূর হইয়া গেল, এবং শকটও আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে আরম্ভ করিলে, আমার বাধার জ্ঞান দূর হইয়া কেবল স্পর্শ-জ্ঞানই থাকিল; এই অবস্থায় শকট অশ্ব-যোজিত হইয়া বেগে সম্মুখে চালিত হইলে, যদি আমি রজ্জু দ্বারা তাহার সঙ্গে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে পূর্ব্বানুভূত বাধা-জ্ঞান দূরে থাকুক, স্থির থাকিবার চেষ্টায় অক্ষমতারূপ একটা স্বতন্ত্র নূতন প্রকারের স্পর্শ-জ্ঞান আমার হইবে; তবেই দেখ, একই বস্তুর সহিত সংস্পর্শে আমার কখনও বাধা-জ্ঞান কখন স্থিতি-জ্ঞান, আবার কখনও স্থিতি-ক্ষমতার

অভাবজ্ঞান হয়। এমতস্থলে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বাস্তব-পদার্থকে আমার গতি বা স্থিতি-রোধের কারণ জ্ঞান করা কি সঙ্গত?

গতি বা স্থিতি-রোধ দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। তুমি যখন উল্লম্ফন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাও, তখন একটু উপরে উঠিয়া তোমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়; ক্ষণকাল পরেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ঊর্দ্ধ গতির বিপরীত গতি লাভ কর, এবং সেই গতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে, তোমাকে তোমার পূর্ব্বাধিকৃত স্থান হইতেও নীচে পাতিত করে। তুমি একটী উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গভীর গহ্বরে পড়িয়া গেলে; এখানে প্রথমতঃ তোমার ঊর্দ্ধগতি হইল, তাহার পর কোন বাস্তব পদার্থকে স্পর্শ না করিয়া তোমার গতিরোধ হইল, তৎপরে তোমার নিম্নগতি, তারপর সেই গতি-রোধ, এবং এইবার গতিরোধের সহিত তোমার পদাদিতে এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইল। এখন এই যে তোমার কয়েক রকমে গতি ও গতি-রোধ হইল, ইহার অধিকাংশই —অধিকাংশ কেন—কোনটীই তুমি অনুভব করিতে পার নাই। তুমি কেবল তোমার গতি-রোধ অনুমান করিতেছ, কল্পনা করিতেছ। এই স্পর্শ সহকৃত বাধাজ্ঞানে সেই স্পর্শ

বা বাধার কারণ যে বাহ্য বস্তু, তাহা আমি কিসে বুঝি? তোমার পদ প্রকৃতপক্ষে ধরণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধরণী এবং তোমার পদ, এতদুভয়ের মধ্যে যে অন্তর বা শূন্য স্থান আছে, তোমার পদ বড় জোর তাহাই স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তোমার স্পর্শ বা বাধা-জ্ঞানের কারণ যদি কোন বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহা সেই শূন্যময় অবস্তু।

আরও বিবেচনা কর, হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে যে গতি হয়, সেই গতির প্রতিরোধ কোন প্রতিকূল গতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইবার নহে; কিন্তু গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া কোন সচেতন পদার্থ ভিন্ন জড় বস্তুতে সম্ভবে না। গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া চিৎশক্তির লীলা খেলা, এবং চিৎশক্তির এই লীলা খেলার বিচিত্রতার বহুলতাই সর্ব্বপ্রকার বাধা জ্ঞানের জননী। চিৎশক্তির একপ্রকার ক্রিয়াবশে হস্ত যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার বিপরীত ক্রিয়াবশে সঙ্কুচিত হয়, এবং এই দুই প্রকার লীলাখেলার রঙ্গভূমিতে বিপরীত ক্রিয়ার শুভ সম্মিলনে বাধা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিৎশক্তির লীলা বৈপরীত্য জন্য যে প্রতিনিয়ত আমাদের বাধাজ্ঞান জন্মিতেছে, তাহার নিষ্ক্রিয় বস্তুর উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। যাহার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, যে নিজ ইচ্ছায়

চলিতে—বা চালিত হইলেও—থাকিতে পারে না, এবং যাহার সহিত আমার দেহের স্পর্শ হইতে পারে না, সে কি করিয়া আমার গতির প্রতিরোধ করিবে? যদি বলি যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল পদার্থই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট, এবং সেই আকর্ষণ জন্য সকল পদার্থেরই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গতি হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই গতি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই নিরুদ্ধ গতিই প্রতিকূল ক্রিয়ার দ্বারা আমার হস্তকে বারিত করে, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে? পৃথিবী কিছু সচেতন পদার্থ নহে। উহাও নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ, সুতরাং জড়া নিষ্ক্রিয়া পৃথিবী আর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? পৃথিবীকেই আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ দ্বারা আমি পৃথিবীকে কিম্বা পৃথিবীর আকর্ষণী ক্রিয়া জানিতে পারিতেছি না, কেবল মায়াবশে কতকগুলি কল্পনাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পনার সহিত মাধ্যাকর্ষণের কল্পনার একতা কল্পনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বরং মানসিক ব্যাপারে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করায় কাল্পনিক অস্তিত্বই স্বীকার করা উচিত। পৃথিবী যে আমাকে আকর্ষণ করি-

তেছে, তাহা কি আমি স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি? কখনই নহে। মাধ্যাকর্ষণের না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে, গন্ধ, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ! পৃথিবীর কল্পনা হওয়ার পর কত কাল গেল, কত শত সহস্র লোকের জন্ম-মৃত্যু কল্পনা হওয়ার পর আমি নিউটন নামা এক ব্যক্তির কল্পনা করিতেছি, এবং সেই কল্পিত ব্যক্তির দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা করাইতেছি। পৃথিবী তাঁহাকে প্রতিনিয়ত মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট করিল, কিন্তু তিনি তাহা টের পাইলেন না; কোথায় গাছ হইতে একটা আম্র ফলকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি থাকা এবং তৎপর জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকার বিষয় অনুমান করিলেন। এ সকলই কল্পনার লীলাখেলা নয় ত কি?

কেহ বলিতে পারেন, আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব যেন নাই থাকিল, রূপ-রসাদি গুণের অস্তিত্ব তো আর অজ্ঞেয় নহে, সুতরাং তাহাদের গুণগত বাহ্য অস্তিত্ব থাকিতেছে; অতএব তাহাদিগকে বাহ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করায় বাধা কি? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, রূপাদির বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি না। রূপাদি আমার ইন্দ্রিয় বা কল্পনা-সাপেক্ষ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বা কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য

পদার্থ নহে; যাহা আমার কল্পনার সাপেক্ষ, তাহাতে আমার কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব অসম্ভব। যখন রূপ থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তির অভাবে তাহা দৃষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে, রূপ না থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তি রূপ গড়াইয়া লইতে পারে; তখন রূপ দর্শন হইল বলিয়াই তাহার বাহ্য অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিব? মদাতঙ্কিত ব্যক্তি কত কল্পিত বিভীষিকা দেখে; আমরা যে স্থলে কিছুই দেখিতে পাই না, সে স্থলেই যে সে কত কি দেখে বা শুনে! পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ই সে অন্যরূপ অনুভব করে, ইহা কি রূপাদির বাহ্য সত্তা আছে বলিয়া, না তাহার উত্তেজিত কল্পনায় তাহাকে ঐ প্রকার অনন্যসাধারণ কল্পনা করায় বলিয়া? যদি রূপাদির জ্ঞান হইতে তাহার বাহ্য অস্তিত্ব অবশ্য গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন বা বিভীষিকা দর্শনকালেও রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এ কথা কেহ স্বীকার করে না এবং করিতেও পারে না; সুতরাং তাহার বাহ্য অস্তিত্ব না থাকাই সঙ্গত।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্বপ্নাদি দর্শন কালে আমরা অবস্তুতে বস্তু দর্শন করি না, বস্তুতেই বস্তু দর্শন করিয়া থাকি; তবে যে সে সকল বস্তু অন্যে দেখিতে পায়

না, তাহার অন্য কারণ আছে। আমার জাগ্রতাবস্থা হইতে সুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অনেকাংশে অন্যরূপ ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বাহ্য রূপাদিরও সময় সময় রূপান্তর হয়। রূপান্তরিত সূক্ষ্ম রূপাদি রূপান্তরিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত রূপাদির জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিকৃত রূপাদি জাগ্রতাবস্থায় অবিকৃত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেরূপ স্থূল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। স্থূলে স্থূলে যে সম্বন্ধ, সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেও সেই সম্বন্ধ, কিন্তু স্থূলে সূক্ষ্মে বা সূক্ষ্মে স্থূলে—মিলিত হইলে, কোন জ্ঞানই হয় না। আজকালকার "স্পিরিচুয়ালিজমের" বাড়াবাড়ির দিনে এ সকল কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ না হইলেও, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝা যায়। আচ্ছা স্বীকার করিলাম, সুপ্তাবস্থায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়, এবং জাগ্রত অবস্থায় স্থূল দৃষ্টি হয়; স্বীকার করিলাম, রূপাদি সময়ে সূক্ষ্ম—সময়ে স্থূল ভাব ধারণ করে, এবং যখন সূক্ষ্ম রূপাদি সূক্ষ্ম দৃষ্ট্যাদির সহিত মিলিত হয়, তখন স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূল বিষয়ের মিলনের ন্যায় স্পষ্ট রূপাদি-জ্ঞান লাভ হয়; তদ্বৈপরীত্যে স্থূল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপাদি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্থূল রূপাদি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু এ সকল মানিয়া লইলেও একটী অলঙ্ঘনীয় সঙ্কট উপস্থিত হইতে

হইবে, যাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। মনে কর, আমি যে সময়ে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, তুমি অন্য ঘরে শুইয়া স্বপ্নাবস্থার সেই সময় আমাকে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিতেছ; এখন বিবেচনা কর দেখি, এইযে একই সময় আমাকে দুইটী স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রকাশ পাইল, ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা? যদি এমন মনে কর যে, আমি স্থূলরূপে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, আর সূক্ষ্মরূপে তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছি, তাহা হইলে এই অতি জ্ঞাতব্য বিষয়টী আমার অজ্ঞাত থাকা কেমন অসঙ্গত!! আমার স্থূলরূপ এক স্থানে থাকিল, আর সূক্ষ্মরূপ অন্য স্থানে থাকিল, অথচ আমার কি স্থূলরূপ, কি সূক্ষ্মরূপ, কি উভয়ের সমষ্টিগত প্রকৃত রূপ, এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও আমি জানিতে পারিলাম না! ইহা বলিতে পারিলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মরূপ অনন্ত পূর্ণভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না! এ প্রকার মীমাংসা বরং কল্পনাতেই শোভা পায়, জ্ঞেয় পদার্থের বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্বে শোভা পায় না। বস্তুতঃ স্বপ্নাদি কালে আমরা

অবিদ্যমান বস্তুতেই বস্তু কল্পনা করি; সূক্ষ্ম বস্তুতে স্থূল দর্শন করি না। আর স্বপ্ন কালে যদি অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে পারি, তাহা হইলে স্বপ্নেতর সময়েই বা অবস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে না পারিব কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব যেন অস্বীকার্য্য হইল, আমার এই প্রত্যক্ষ দেহাদির সত্তা কি স্বীকার্য্য নহে? প্রশ্নটী নিতান্ত সঙ্গত এবং উত্তরটীও বড় সোজা নহে! যাহা হউক, এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু দেহাদির বাস্তব সত্তা আছে কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে গেলে, "আমি কি" সে আলোচনাটি অতি প্রয়োজনীয় হয়; অতএব "আমি কি" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, আমার সঙ্গে দেহাদির কি সম্বন্ধ?

পরিশিষ্ট।

আমি কি? এই কেশ কি আমি? এই হস্ত, এই পদ, এই নাসা, এই চক্ষু, ইহাদের প্রত্যেক কি 'আমি' শব্দে বাচ্য? অবশ্য এ সকলের কোন একটী আমি নহে। যেমন এই বস্ত্রখানির এ সূতাটী বস্ত্র নহে, ও সূতাটী বস্ত্র নহে, সে সূতাটীও বস্ত্র নহে—সমুদয় সূত্রের তথাবিধ একত্র অবস্থানই বস্ত্র। যেমন এই টেবলটীর এ পা খানি টেবল্ নহে, ও পাশিটা টেবল্ নহে, উপরের কাষ্ঠখানিও টেবল্ নহে, এই সমুদয়ের তথাবিধ সমাবেশই টেবল্। যেমন সম্মুখস্থ দালানটীর এই কড়ীটা দালান নহে, ও বর্গাটী দালান নহে, ঐ ইষ্টকখানি দালান নহে, এতৎ-সমুদয়ের তথাবিধ মিলন ও বিন্যাসই দালান। সেই রূপ আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, একক কোনটীই 'আমি' নই, এ সকলের এবম্বিধ সমাবেশে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্টরূপ বিন্যাসজন্য যে হস্ত-পদাদি-সংযুক্ত সচেতন-মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়,' তাহাকেই সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন এই বস্ত্র খানির একটী সূত্র খুলিয়া গেলেও বস্ত্র খানিকে অসম্পূর্ণ

মনে করি না, যেমন দালানটীর অত্যল্পাংশ খসিয়া পড়িলেও দালানের দালানত্ব লোপ পায় না, যেমন টেবলের একটী কোণ হইতে একটু কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেও যে টেবল্ সেই টেবলই থাকে, তেমনই মস্তক মুণ্ডন করিলে, বা (এমন কি) হস্তপদহীন হইলেও সাধারণতঃ আমি আমিই থাকি। কিন্তু যেরূপ বস্ত্রখানির খানিকটা ছিঁড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র বলি, টেবলের একাংশ নষ্ট হইলে, ভাঙ্গা টেবল বলি, এবং ঐরূপ দালানের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভাঙ্গা-দালান বলিয়া বুঝি, তদ্রূপ আমার চক্ষু নষ্ট হইলে আমি অন্ধ হই, পা অচল হইলে পঙ্গু হই, ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল পদার্থের যেরূপ সমাবেশে আমার উৎপত্তি, মূল-সমাবেশ স্থির রাখিয়া, সেই সকল পদার্থের (নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ন্যূনাতিরেক যোগ-বিয়োগে সাধারণতঃ আমিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি মনে করিনা বটে, কিন্তু পূর্ণ আমিত্বের পরিবর্ত্ত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। একই আমি ভ্রূণাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সাধারণভাবে একই থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি সর্ব্বাবস্থায় এক থাকি না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার অন্তর্বাহ্য সত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে এবং এত অলক্ষিতভাবে হইয়া থাকে যে, বিশেষ চিন্তা

করিয়া না দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গর্ভস্থ 'আমি' আর বৃদ্ধ 'আমি'তে রূপে-গুণে জ্ঞানাজ্ঞানে এত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ক্রমে ক্রমে না হইয়া যদি সহসা হইত, তাহা হইলে অপরে আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক, আমিই আমাকে চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! শৈশবে যে আমাকে একবার দেখিয়াছে অশীতি বৎসরান্তে দ্বিতীয়বার দেখিলে, সে কি আমাকে সেই শিশুর পরিণতি বলিয়া জানিতে পারে? কিন্তু যে আমার নিত্য-সহচর, সে বয়োবৃদ্ধির সহিত পর পর আমার রূপ-গুণাদির ক্রম-পরিবর্ত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে বলিয়া আমাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাহউক, অনেকেরই সংস্কার 'আমি' 'আমার' দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটী যুক্তি এই যে, আমরা যখন আমার হাত, আমার পা, আমার চক্ষু, আমার মন, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করি, তখন অবশ্যই এই মনে করি যে, আমাদের বাড়ী, ঘর, ঘটী, বাটী, ছাতী, লাঠীর মত আমার হস্ত-পদও আমা হইতে ভিন্ন। ইহা না হইলে, আমার হাত, আমার পা না বলিয়া, আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি বলিতাম। যুক্তিটি বড় লোকের, সুতরাং অগ্রাহ্য করিতে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে হস্ত-

পদার্থ হইতে আমার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমের খোসা, আমের আঁঠি, আমের রস, এসকল প্রয়োগ দেখিয়াও বলিতে হইবে যে, খোসা, আঁঠি, রস, এ সব আমের অংশ নহে! অথবা ছাতীর ডাঁট, ছাতীর শিক, ছাতীর কাপড়, ইহারা ছাতীর কোন অংশ নহে; যেন ছাতী হইতে এ সকলগুলি বাদ দিলেও যে ছাতী সেই ছাতীই থাকে। ফলে চৈতন্যের অভাব ও সদ্ভাব-ভেদে উক্ত যুক্তি সঙ্গত হইলেও, অর্থাৎ চৈতন্যই মানুষের খাস আমিত্বের সম্বল ধরিয়া নিলেও "আমার মন" "আমার আত্মা" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া তবে বলিতে হয় যে, আমি ও আমার আত্মা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি হস্তের অভাবে আমার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলেও যে আমি সেই আমিই থাকি; এমন কি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সহিত দেহের লোপ হইলেও আমার আমিত্ব নষ্ট হয় না, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা আমিত্বকে বাড়াইতে যাইয়া আমিত্ব-জ্ঞানের পথই বন্ধ করেন, কার্য্যতঃ আমিত্বকে বিনাশ করিয়া নামতঃ তাহাকে রক্ষা করেন। আমার সাংসারিক আমিত্ব কিসে? আমার জ্ঞানেই আমার আমিত্ব। "নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽয়মাত্মা" নিত্যোপলব্ধি-

স্বরূপ আত্মাই অহং-বাচ্য। জ্ঞান যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ। যেই জ্ঞানের অভাব, সেই আমারও অভাব। জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধিতে আমার হ্রাসবৃদ্ধি। জ্ঞানের স্ফুরণে আমিত্বের জন্ম, জ্ঞানের বিলোপে আমিত্বের মরণ। মনুষ্য-জীবন একটী মায়িক জ্ঞানের ধারা। যেখানে এই মায়িক জ্ঞান-প্রবাহের সহসা পরিবর্ত্তন হয়, সেইখানেই লৌকিক জন্ম বা মৃত্যু। ইহা ভিন্ন লৌকিক জন্ম মরণের অন্য ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই মায়াবচ্ছিন্ন জ্ঞান-ধারার দুইটি পরিবর্ত্তন দিকের মধ্যস্থানে সামান্য স্রোতগতি ঋজুবক্র হইতেছে এবং বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। তাহাতেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি কত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কত পুরাতন জ্ঞান হারাইয়াছি। কত শিখিতেছি, কত ভুলিতেছি। যাহাহউক, এই মায়িক জ্ঞান-ধারা আমার মায়িক ইন্দ্রিয়-পথে প্রবর্ত্তিত হয়। শক্তিরূপী—মায়ারূপী ইন্দ্রিয়েই আমার সাংসারিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিনাশ কর, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে; মায়ার উচ্ছেদ কর, মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে—মায়াশ্রিত আমিত্ব লোপ পাইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে—মায়াকে অস্বীকার করিয়া মায়াবচ্ছিন্ন আমাকে বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মায়িক ইন্দ্রিয় সকলকে আমার মায়িক অবস্থার

মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিবেচনা করা সঙ্গত হইতেছে, এবং বিশ্ব-রচনা কার্য্যে মায়িক জ্ঞান-ধারার আধার-রূপে হস্ত-পদাদিরও কল্পনা করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে।

হস্ত-পদাদিকে ইন্দ্রিয়তত্ত্বের এক পাশে স্থান দিলেও আমি কিন্তু তাহাদের পারমার্থিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বলিতেছি না। ইন্দ্রিয়লভ্য যত কিছু, সকলই বাহ্য, এবং যাহা কিছু বাহ্য, তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, সুধু কাল্পনিক—মায়িক। আমার মায়া-রাজ্যের একটি নিয়ম এই যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-ধারা ইন্দ্রিয়-খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। হস্ত-পদাদি আমার সেই সৃষ্টি শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সকলের কল্পিত কর্ম্মাধার (কর্ম্মেন্দ্রিয়) মাত্র। স্বপ্নের দৃষ্টান্তে কথাটা একটু পরিষ্কার করি। স্বপ্নকালে আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যতঃ অক্রিয় অবস্থায় দৃষ্ট হইলেও, আমার কল্পনা-শক্তি অপর কতকগুলি মায়িক হস্ত-পদাদি সৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে ; সুতরাং অন্ততঃ স্বপ্ন সময়ে আমি চক্ষু-কর্ণাদি কল্পনা করিয়া সেই মায়াময় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাৎকালিক দর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে,—

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্চত্যচক্ষুঃ
স শৃণোত্য কর্ণঃ—(ইত্যাদি)

বস্তুতঃ হস্ত-পদাদির বাহ্য অস্তিত্ব নাই; তবে আমি তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব এবং তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কল্পনা করি; খাস আমিত্বে তাই তাহারা আমার অঙ্গ-স্বরূপ। যখন সেই কল্পিত হস্ত-পদাদির অস্তিত্ব-কল্পনা করি না, তখন সেই সেই অঙ্গের কল্পিত ক্রিয়াদিরও কল্পনা করি না। চক্ষু নাই, এই কল্পনার সঙ্গে দর্শনাভাব কল্পনা করি। কর্ণের অকল্পনার সঙ্গে শ্রবণাভাব কল্পনা করি। হস্তাভাব-কল্পনার সহিত গ্রহণ-ক্রিয়াভাব কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা চিরস্থায়ী নহে, সকলই সাময়িক ও মায়িক।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতাঃ
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরং।

অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বভূতের সৃজন শক্তিশীলত্বের পরম তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি আপনাকে মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করি; পরমার্থতঃ আমার হস্ত-পদাদির কোন দেহ নাই।

আমি যখন আমিত্বের আলোচনায় পটু হইব, যখন কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত কল্পিত দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ আর কল্পনা না করিয়া তদ্বিপরীত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য কল্পিত জগৎ হইতে টানিয়া

লইয়া আমাতেই স্থির করিব, (তদা স্বরূপেঽবস্থানম্) তখন আমার সৃষ্ট্যুত্তর "Sabbath Day" অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবান্ত উপস্থিত হইবে। আমি তখন পরিদৃশ্যমান সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সুদীর্ঘ-সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া, চিদাত্মারূপে স্বরূপে অবস্থান করিব। তখন আমার হস্ত-পদাদি কিছুই থাকিবে না। আবার সুদীর্ঘকাল পরে স্বরূপ সংহত করিয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইয়া তটস্থ লক্ষণে বিচিত্র বিশ্বরচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। তখন আবার আমার হস্ত-পদাদি সমুদয় পরিকল্পিত হইবে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে একমাত্র পদার্থ, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহা চৈতন্যময় আমিই। আর আমি ভিন্ন যত কিছু, (তা আমার দেহই হউক, আর দেহাতিরিক্ত তোমরাই হও) সমুদয়ই মায়িক, সমুদয়ই আমার কল্পিত—আমার সৃষ্ট; ঠিক এখন আমার মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার স্বরূপতঃ ইচ্ছা হইলে, এখনই এই জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহার স্থানে অন্যরূপ সৃষ্টি গঠিত হইবে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্ত্তা—সে ত আমিই!—"সোঽহং ব্রহ্ম" সৃষ্টিকর্ত্তা যখন জাগরিত থাকেন কি না সৃষ্টি চিন্তা করেন, তখন "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।" মদীয় অব্যক্তশক্তি নিহিত এই জগৎ ব্যক্ত হইয়া থাকে,

এবং যখন তিনি শান্ত হইয়া নিদ্রিত হয়েন তখন "রাত্র্যা-গমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।" এই ব্যক্ত জগৎ মদীয় অব্যক্ত শক্তিতে বিলীন হয়, তাই "যদা সদেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি।" এবং এইরূপে "ভূত গ্রামঃ সএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে" সেই ভূতগ্রাম পরাব্যক্ত পরমেশ্বর-নিয়োজিত কর্ম্মবশে অব্যক্ত আমা হইতে আমার কল্পনার বিরাম সময়ে পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত এবং আমার কল্পনার লীলা সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমি সেই ব্রহ্মা; কিন্তু তুমি কি? যদু, মধু, রাম, শ্যাম, তুমি, তোমরা যে কেহ, আমার কল্পিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—যাহাকে আমি আমার কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া "তুমি" বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, এসকল কি? না "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই ব্রহ্মা। যেমন আমি এই জগতের স্রষ্টা, তেমনি তোমরা আমার সৃষ্ট, স্রষ্টা! স্রষ্টা ও সৃষ্ট, উভয়েই সেই ব্রহ্ম। পুরুষ যেমন প্রকৃতিতে রমণ করেন, তদ্রূপ আমি যখন আমার কল্পনাতে রমণ করি—স্রষ্টা যখন সৃষ্টির আলোচনা করেন—তখন, "যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ" এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত

হয় ; আবার পুরুষ যখন প্রকৃতির রতি ত্যাগ করেন, (আমি যখন আমার সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টিকল্পনা হইতে বিশ্রাম লাভ করি) স্রষ্টা যখন সৃষ্টি ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন—"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি" এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর সকলই মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কোথায় আসিলাম ! পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মের অন্বেষণে বাহির হইয়া বিশ্বচরাচর খুঁজিয়া দেখিলাম যে আমিই সেই ব্রহ্ম ! আর মদিতর যত কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মের—"তত্ত্বমসি" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের মহিমাবৃত। আমি এই সকল কল্পনা করিতেছি, এবং আমার কল্পিত তোমরা কল্পনাময় আমার অন্তর্গত ; সুতরাং তোমাতে আমাতে আশ্রিত-আশ্রয়ভাববৎ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কল্পিত। সেই জন্য তুমিত্ব জ্ঞান দূরে রাখিয়া, আমার আমিত্ব-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। যখন তোমাকে হারাই, তখন বিশ্বস্রষ্টারূপী আমি আমাকেও বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমাকে পাই, তখনই আবার আমার বিশ্বস্রষ্টৃত্বভাবের আমিত্ব জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়। তাই তুমি-আমি সাংসারিক দৃষ্টিতে—মায়িক দৃষ্টিতে—দর্পণের প্রতিবিম্ববৎ পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব-

সাপেক্ষ। আমি স্রষ্টা ও তোমরা সৃষ্ট; আমি কারণ, তোমরা কার্য্য; কিন্তু যেমন কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অভেদরূপে কারণে থাকে, তদ্রূপ তোমরা কল্পিত হওয়ার পূর্ব্বে আমার প্রসুপ্ত কল্পনা মধ্যে লীন ছিলে, এবং যেমন "কার্য্যস্ত কারণাত্মকত্বাৎ" কারণই কার্য্যোৎপত্তির আংশিক রূপে কার্য্যে অনুপ্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আমার কল্পনাই তোমাদের রূপ ধারণ করিয়া আমাহইতে পৃথক্‌বৎ দেখায়। "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্ব-ভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতং॥" এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত-মূর্ত্তি আমারই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ সকলই আমার কল্পনার অন্তর্গত, আমি ইহাদের অন্তর্গত নহি; আমি এইরূপ কল্পনা করি বলিয়াই ইহারা এইরূপ দেখায়; নতুবা ইহারা আছে বলিয়া আমি এইরূপ দেখি না। আবার "নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।" এই সকলই আমার কল্পনাগত হইলেও, ইহারা আমার স্বরূপের অন্তর্গত নিত্য পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট—আমার ইহা একটি অঘটন ঘটন-চাতুরী যে, আমি এই সকলের উৎপত্তি স্থিতির কারণ হইয়াও আমি ইহাদের অন্তর্গত পদার্থ নহি। বস্তুতঃ তোমরা সকলই আমার কল্পনাসম্ভূত এবং আমার

কল্পনা-সম্ভূত বস্তু ভিন্ন আমা হইতে পৃথক্ এমন কিছু বাহ্য বস্তু আমার সৃষ্টির মধ্যে নাই; সুতরাং আমার পরিকল্পিত জগতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম কিন্তু এই সকলই কি অনাদ্যন্ত-দেশ-কালব্যাপী সকলেরই শেষ? আমার সৃষ্টিই কি চূড়ান্ত সৃষ্টি এবং আমার সৃষ্টি ছাড়া কি আমার অজ্ঞাত অন্য কোন সৃষ্টি নাই? আমার সৃষ্টির বাহিরে অন্য সৃষ্টি নাই—একথা আমি কল্পনা করিতে পারি না, বরং আমি বুঝিতে পারি যে, প্রভূত শক্তি থাকিতেও আমি আমার কল্পিত কাল ও দেশের আদি-অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারি না; পরন্তু বুঝিতে পারি যে, আমার কল্পনার উপর আমার কোন স্বাধীন নিয়ন্তৃত্ব নাই, যেন কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বময় শক্তির সম্পূর্ণ বশতাপন্ন হইয়া তাহারই হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছি। অধিক কি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর-কল্পনা করিবার আমার যে এক ক্ষমতার এত বড়াই করিয়া আসিলাম, তাহাও সেই অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্রাংশ-বিশেষ; পরমার্থতঃ চরাচরভূত সকলেঁর কারণীভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য যে অব্যক্ত-শক্তি আমি, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরাব্যক্ত শক্তি, তিনি সনাতন এবং মদীয় ভৌতিক কল্পনার বিনাশ

হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তিনিই প্রকৃত অব্যক্ত-পদ-বাচ্য অক্ষয় পুরুষ, আর তিনিই সকলের পরমা গতি; তাঁহাকেই জানিতে পারিলে আর কল্পনাগত জরা মরণ-ভাবময় সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। "পরস্তস্মাত্তু ভাবোন্যোহব্যক্তোব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ সঃ সর্ব্বেষু-ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতিঃ" "অব্যক্তাক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।" "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অনাদ্যন্ত-অচিন্ত্য শক্তি পরমাশ্চর্য্য পরমপুরুষের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং সকলের সর্ব্বময়কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি।

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ॥
বায়ু র্যমোহগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমোস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত-বিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ॥"

সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, তাঁহারই একটী জ্ঞানধারা ব্রহ্মরূপী আমাদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান

স্থষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব করাইতেছেন, এবং তিনিই আমার কল্পনা-শক্তির কেন্দ্রস্থানে বসিয়া, কেমন অলক্ষিতভাবে তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া প্রকৃতি-প্রসঙ্গাধীন পুরুষ আমাকে ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ নাচাইতেছেন! জানিনা, সেই মহাপ্রভু আমাকে আবার কখন কোন্ স্রোতে ভাসাইয়া কোন্ দিকে লইয়া যাইবেন। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, তিনিই—যখন যে পথে ইচ্ছা—অহং জ্ঞান-বাচ্য জ্ঞান-ধারাকে প্রবাহিত করেন। তিনি আমাকে তাঁহার ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কেননা, তাঁহার ক্রোড় ছাড়া স্থান কল্পনায় আইসে না, এবং যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ক্রোড় সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাই। সেই পরম জ্ঞান-ধারার কেন্দ্রস্থান অনির্দ্দিষ্টরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, এবং তাঁহার আদি-অন্ত কোথাও নাই।

"নান্তং নমধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥"

হে প্রভো! আমি সম্পূর্ণরূপে এই সকল সৃষ্টি জানিনা, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টির সুখ-দুঃখে পরমার্থতঃ অনাসক্ত করাইয়া, সেই

আমাকে মায়াপহৃত করিয়া, কখনও হৃষ্ট, কখনও ক্লিষ্ট করিতেছ।

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

হে প্রভো! কি প্রকার কল্পনায় সুখ হয়, তাহা বুঝি, কিন্তু সে প্রকার কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি না; কি প্রকার কল্পনায় দুঃখ হয়, তাহাও বুঝি, কিন্তু সে কল্পনা নিবারণ করিতে পারি না। তুমি সর্ব্বপ্রকার কল্পনার ঈশ্বরস্বরূপ আমাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদ্বারা যখন যেমন কল্পনা করাও, আমি তখন তেমনই ভিন্ন অন্যরূপ কল্পনা করিতে পারি না। অক্ষমতা প্রযুক্ত সুখকর কল্পনা দ্বারা (তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে রহিয়াও) শান্তি-সুধাপান করিতে অশক্ত হই। অতএব আমি সর্ব্বদা তোমার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শান্তি-সুখকর কল্পনা করিবার ক্ষমতা ও উপায় শিক্ষা দেও।

—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

সমাপ্ত